উৎস মানুষ

৩১ বর্ষ ● ৩য় সংখ্যা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
জলাশয় নিয়ে আইন	মোহিত রায়	২
গল্প বলা	রাজেশ দত্ত	৪
চিকিৎসার ভুল	ভবানীপ্রসাদ সাহু	৫
এবার বর্ষা কেমন হবে	বিবেক সেন	৮
ডিওডোরান্ট	জয়ন্ত দাস	১১
বেপরোয়া বনবিহারী	সমীরকুমার ঘোষ	১৫
বিজ্ঞানবোধ ও নৈতিকতা	সুজিতকুমার দাস	১৮
শতাব্দীর শেষের ভাবনা	বাদল সরকার	২৪
সঞ্জয়ের দিব্যদৃষ্টি	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২৮
ছিঁড়ে যাক মিথ্যার জাল	আশীষ লাহিড়ী	৩০
সংগঠন সংবাদ		

সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ

পরিচালকমণ্ডলী: বরুণ ভট্টাচার্য, শ্যামল ভদ্র, চিত্ত সামন্ত, পারমিতা দত্ত, ঝিল্লী ব্যানার্জি

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা-৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬

ফোন:৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com

ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

utsamanush1980@gmail.com

আমাদের কথা

দধিচি মুনির মতো অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় বুকের পাঁজর দিয়ে বজ্র নয়, গড়ে তুলেছিলেন 'উৎস মানুষ' পত্রিকা। উদ্দেশ্য ছিল যুক্তিনির্ভর বিজ্ঞানমনস্কতাকে ছড়িয়ে দেওয়া। বাজারে 'উৎস মানুষ সমান সমান অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়' সমীকরণটি জনপ্রিয় হলেও বরাবরই তাঁর পাশে ছিলেন কয়েকজন বন্ধু ও সমমনস্ক মানুষজন। যাঁদের মেধা, ভালবাসা, নিঃস্বার্থ শ্রম না পেলে পত্রিকা বেঁচে থাকত না। দু-তিনজন ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দেওয়ার মতো হঠকারিতাও করেছিলেন। এঁদের অস্তিত্ব অস্বীকার করলে ইতিহাসের অবমাননা করা হয়। নানা কারণে শুরুর অনেকে দূরে সরে গেছেন, কেউ ছাড়া-ধরা করেছেন, দু-চারজন নেই-আঁকুড়ে লেগে আছি। অশোক-উত্তর কালে পত্রিকাটিকে সসম্মানে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। এই অবস্থায় প্রতিদিন নানা অভিজ্ঞতা ঋদ্ধ করছে আমাদের। দেখছি, যতই বিজ্ঞান আন্দোলন করি, ব্যক্তিপূজার মোহ পিছু ছাড়ে না। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রয়াণের পর তার বিস্তর প্রমাণ মিলতে লাগল। কেউ 'অশোকদার কাজ'কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলছেন। কেউ একটু এগিয়ে এই পত্রিকা প্রকাশকে প্রকাশ বলেই গণ্য করছেন না। কেউ তাঁকে পত্রিকা নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাচ্ছিল্যের সুরে বলছেন, না না উৎস মানুষফানুষ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলীর একজনের সঙ্গে কথা মতো একজন একটি লেখা তৈরি করে পাঠানোর জন্য আমাদের এক 'পরম সুহৃদ'কে বলেন। পৌঁছে দেওয়া দূরস্থান, তিনিও উঠে যাওয়ার কাহিনী শুনিয়ে দেন। যার যা রুচি! জল যেদিকে গড়াচ্ছে কেউ ফুলমালা চাপিয়ে অশোক-পূজো করার কথা বললেও অবাক হওয়ার থাকবে না। পত্রিকার এক পুরনো বন্ধু পিতার মৃত্যুর পর মস্তকমুণ্ডন করলেন। উৎস মানুষের নীতির কথা মনে করিয়ে দিতে তাঁর পাল্টা যুক্তি, আগেও কেউ একজন নেড়া হয়েছিলেন, অশোকদা তাঁকে কিছু বলেননি। প্রশ্ন তুললেন, বর্তমান পরিচালকমণ্ডলী কি অশোকদার চেয়েও বড় বিপ্লবী? একজনের আবদার বিশেষ লেখার। তাঁর সঙ্গে নাকি একান্তে এ নিয়ে অশোকদার কথা হয়েছিল। বিষয় আমাদের মনোমত না হওয়ায় তাঁর গোঁসা হয়েছে। এই অশোক-আচ্ছন্নদের নিয়ে হয়েছে মহামুশকিল। এঁরা বিভিন্ন হুমকি দিচ্ছেন। অচিরেই হয়ত অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ও সহি সহ খাঁটি উৎস মানুষ পত্রিকা প্রকাশ করে ফেলবেন। ফেলুন। আমাদের ক্ষতি নেই। পাঠকদের উপকার হলেও হতে পারে।

বেশ ধর্মকর্ম নিয়ে ছিলেন। খামোখা নিগমানন্দ কেন যে গঙ্গাকে বাঁচানোর জন্য অনশন করতে গেলেন কে জানে! করলেনই যখন, তখন আন্না বা রামদেবের দেখে শিখতে পারতেন—কীভাবে সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করতে হয়, বাজার গরম করতে হয়। বিস্তীর্ণ দু পারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও গঙ্গা বয়ে চলেছে। গঙ্গা-ব্যবসায়ীরা দিব্যি বেঁচেবর্তে আছেন। মাঝখান থেকে প্রাণটা খোয়ালেন নিগমানন্দ। বোঝা গেল, এই যুগে 'বোকা' লোকেরও অভাব নেই।

জলা, জলাশয় নিয়ে নতুন আইন ও সমস্যা

মোহিত রায়

খবরে প্রকাশ ভারত সরকারের জলাভূমি সংক্রান্ত এক নতুন বিধির ঠেলায় রাজ্য সরকারের আমলাদের পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বাঁচাতে নতুন করে পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন দপ্তরকে তাদের মতামত ৩০ এপ্রিল ২০১১-র মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে। জনসাধারণের মতামত নেওয়ার জন্য ওয়েবসাইটে জানানো হবে বলা হয়েছে।[১] যদিও পরিবেশ দপ্তর বা পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ম্যানেজমেন্ট অথরিটির ওয়েবসাইটে এ সম্পর্কিত কোন তথ্য দেওয়া নেই। ভারতীয় আইন চূড়ান্ত করা আগে খসড়া (Draft) আইন (Act) বা বিধি (Rule) প্রকাশ করে সবার মতামত চাওয়া হয়। এক্ষেত্রে এই বিধি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের আমলারা আগে কোন মতামত পাঠিয়েছিলেন কিনা জানা নেই। এই নতুন বিধি সম্পর্কে আলোচনার আগে জলাশয় বা জলাভূমি কাকে বলব তা জেনে নেওয়া যাক।

জলা, জলাশয়, জলাভূমি

সাধারণ বাঙালির কাছে জলাশয় কোনো নতুন কিছু নয়। তার একেক ধরণ, আয়তন, ব্যবহারের জন্য তার ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। জলাশয় বলতে আমরা ঝিল, দীঘি, পুকুর, সরোবর, হ্রদ, হাওর এদের বুঝি। আর কিছু জল ও ডাঙার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য নামগুলি হল ডোবা, জলা, বাদা, বিল ইত্যাদি। জলাভূমি কথাটি সম্প্রতি খুবই চালু কথা। জলাভূমি বলতে আদতে বোঝান হয়েছিল সম্পূর্ণ স্থল ও জলের মাঝামাঝি একটি মিশ্র অঞ্চল, তার জলের মান বা মানবিক ব্যবহার যাই হোক। ১৯৭১ সালে ইরানের রামসার শহরে প্রথম একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় যার নাম ছিল 'আন্তর্জাতিক বিশেষতঃ ওয়াটারফাউলের বাসস্থান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি সংক্রান্ত কনভেনশন'।[২] এই প্রথম সরকারি স্তরে জলাভূমি নিয়ে আন্তর্জাতিক কোন প্রচেষ্টার শুরু। তখন থেকেই জলাভূমি বা ওয়েটল্যান্ড শব্দটির পরিচিতি বাড়তে থাকে। ১৯৮৪ সালে ইংরেজিতে প্রকাশিত প্রতিবেশ (Ecology) সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তকেও জলাভূমি বা ওয়েটল্যান্ড শব্দটির অস্তিত্ব ছিল না।[৩] ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত মিৎসচ ও গসচলিংকের লেখা জলাভূমি (Wetland) এ সম্পর্কিত একটি প্রধান বই।[৪] এতে ৭১১টি তথ্যসূত্রের মধ্যে মাত্র ৪টিতে ১৯৭১ সালের আগে জলাভূমি কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। জলাভূমি কথাটা অবশ্য বাংলায় একেবারেই অর্বাচীন, এখনও সব বাংলা অভিধানে তার স্থান হয় নি। কথাটা ইংরেজি ওয়েটল্যান্ড (wetland)-এর সরাসরি বঙ্গানুবাদ। বাংলায় জলাভূমি বোঝাতে জলা, বাদা, বিল ধরনের বিভিন্ন শব্দই ব্যবহৃত হত। শ্রী হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বঙ্গীয় শব্দকোষে 'জলা'-র অর্থ লেখা আছে 'জলমগ্ন নিম্নভূমি' ও 'বিল'।[৫] আমার মনে হয় জলাভূমির জায়গায় জলা কথাটি ব্যবহৃত হলে বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে অনেক সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য হবে।

জলাভূমি শব্দটি চালু হবার পর এর ব্যবহার হতে শুরু হয় বিভিন্ন ভাবে। রামসার কনভেনশনের জন্য একসময় প্রায় সব জলাশয়কেই জলাভূমি বলা শুরু হল। রামসার কনভেনশনে জলাভূমির সংজ্ঞায় ধরা হল 'হ্রদ, নদী, জলা, বাদা, জলের মধ্যকার ঘাসবন, পিট, খাঁড়ি, তটের নিকটবর্তী সমুদ্র, ম্যানগ্রোভ, প্রবাল প্রাচীর এবং মনুষ্য-সৃষ্ট মাছের পুকুর, ধানক্ষেত, বাঁধ আর নুনের ভেড়ি', প্রায় কিছুই বাদ নেই।[৬] বিভিন্ন বিবেচনার পর ১৯৭৯ সালে U.S Fish and Wildlife Service-এর বিজ্ঞানীদের গৃহীত জলাভূমির সংজ্ঞাটিই সবচেয়ে সম্পূর্ণ। *Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United States*—রিপোর্টে এই সংজ্ঞাটি দেওয়া আছে। এতে বলা হয়েছে—'জলাভূমি স্থল থেকে জলের মাঝামাঝি একটি পরিবর্তনশীল অঞ্চল যেখানে জলতল সাধারণতঃ মাটির কাছাকাছি থাকে বা যেখানে মাটি অগভীর জলে ঢাকা থাকে'। U.S Fish and Wildlife Service-এর মতে জলাভূমি হবার জন্য নীচের তিনটি শর্তের অন্তত একটি পালনীয়।

১) অঞ্চলটি সবসময় বা বর্ষার সময় অন্তত সাতদিনের জন্য জলমগ্ন থাকে। ২) অঞ্চলটিতে বছরের কিছু সময় জলজ উদ্ভিদ থাকে। ৩) অঞ্চলটির মাটি মূলত জল-সম্পৃক্ত ফলে এর উপরিস্তরের মাটিতে অক্সিজেনের অভাব (anaerobic) থাকে।

বিভিন্ন ধরনের জলাভূমি রয়েছে। U.S Fish and Wildlife Service চারটি প্রধান বর্গের মধ্যে কুড়ি ধরনের জলাভূমি চিহ্নিত করেছে। এই চারটি প্রধান বর্গ হল—১) স্থলভাগে মিষ্টি জলের অঞ্চল ২) স্থলভাগে নোনা জলের অঞ্চল ৩) উপকূলে মিষ্টি জলের অঞ্চল ও ৪) উপকূলে নোনা জলের অঞ্চল।

আমাদের দেশে জলাশয় বা জলাভূমি কাকে বলা হবে তা নিয়ে কোন আইন ছিল না যদিও জলাশয় পরিষ্কার রাখা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে অনেক আগে থেকেই বেশ কিছু আইন ছিল। যেমন ১৯৩৬ সালের Bengal Water Hyacinth Act বা ১৯৩৯

সালের Bengal Tank Improvement Act। ১৯৭৪ সালের জল দূষণ (নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ) আইনে জলাশয় দূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, ১৯৮৬ সালের পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইনেও এরকম কথা আছে। কিন্তু এগুলিতে জলাশয়ের ঠিক কোন সংজ্ঞা নেই। ১৯৯৩ সালে ১৯৮৫ সালের West Bengal Inland Fisheries Act সংশোধন করে প্রথম জলাশয়ের একটি ন্যূনতম আয়তনের কথা বলা হল। এতে বলা হল জলাশয়ের মানে হচ্ছে ১) তা প্রাকৃতিক কারণে বা মানুষের তৈরি কোন নীচু জায়গা যার পাড়সহ আয়তন ৫ কাঠা বা ০.০৩৫ হেক্টর বা তার বেশি; ২) যাতে বছরে অন্তত ছয় মাস জল থাকে ও ৩) তাতে মাছ চাষ করা যেতে পারে। এই আইনটি পশ্চিমবঙ্গে পুকুর ভরাট বন্ধ করতে সবচেয়ে কার্যকরী হয়েছে।

জলাভূমি নিয়ে নতুন বিধি

এবার আসা যাক ভারত সরকারে সাম্প্রতিক আইনে। ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার Wetlands (Conservation and Management) Rules 2010 [জলাভূমি (সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) বিধি ২০১০] পাস করেন। এটি ১৯৮৬ সালের পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইনের অধীনে একটি বিধি। এটি প্রণয়নের প্রস্তুতি কয়েক বছর ধরেই চলছিল এবং জনসাধারণের মতামত আহ্বান করে দুবার এর খসড়া প্রকাশিত হয়। প্রথম খসড়াটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০০৮ সালে। Centre for Science and Environment, New Delhi-এর অনুরোধে দুবার এই লেখক তার মতামত পাঠান। লেখকের ও অন্যান্যদের মতামতের কিছু অংশ Down to Earth প্রকাশিত হয়।[৭] এই আইনে জলাভূমির একটি সংজ্ঞা দেওয়া হয় যা মূলত রামসার কনভেনশনের সংজ্ঞার নকল কেবল এতে ধান ক্ষেত, নদী ও উপকূলবর্তী জলাভূমিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই আইনে জলাভূমির কোন ন্যূনতম আয়তনের কথা বলা নেই।

এই আইনে জলাভূমির সংজ্ঞার ইংরাজি ও বাংলা ভাষান্তর নীচে দেওয়া হল।

'জলাভূমি' বলতে বোঝায়—একটি অঞ্চল যা বিল, ফেন, পিটল্যান্ড ও জল; প্রাকৃতিক বা মনুষ্যকৃত; স্থায়ী বা সাময়িক, যাতে জল স্থির বা চলমান, নির্মল, তিক্ত বা নোনা, এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সমুদ্রের যে অংশে ভাঁটার সময় ছয় মিটারের বেশি জলের গভীরতা থাকে না ও সমস্ত স্থলভাগের জল যেমন সরোবর, জলাধার, পুকুর, ব্যাকওয়াটার, সমুদ্র নিকটবর্তী হ্রদ, খাঁড়ি, মোহানা, এবং মানুষের তৈরি জলাভূমি এবং জলাভূমিকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অঞ্চল যেমন কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত জলাভূমির নিকাশী বা অববাহিকা অঞ্চল কিন্তু প্রধান নদীপথ, ধানক্ষেত ও উপকূলবর্তী জলাভূমি এর মধ্যে গণ্য হবে না।

"wetland" means an area or of marsh, fen, peatland or water; natural or artificial, permanent or temporary, with water that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed six meters and includes all inland waters such as lakes, reservoir, tanks, backwaters, lagoon, creeks, estuaries and manmade wetland and the zone of direct influence on wetlands that is to say the drainage area or catchment region of the wetlands as determined by the authority but does not include main river channels, paddy fields and the coastal wetland covered under the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest, S.O. number 114 (E) dated the 19th February, 1991 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) of dated the 20th February, 1991;

নতুন বিধির সমস্যা কি?

এই আইনে জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য কি কি করা যাবে না তার একটি তালিকা করা আছে ও কি কি করতে গেলে বিশেষ অনুমতি নিতে হবে বলা হয়েছে। এই বিধির 4 (1) (v) ধারায় বলা হয়েছে যে জলাভূমিতে কোন শিল্প বা শহরের অশোধিত বর্জ্য জল ফেলা যাবে না। যদি এখন তা ফেলা হয়ে থাকে তবে এক বছরের মধ্যে তা বন্ধ করতে হবে। এখানেই সমস্যা তৈরি হয়েছে পূর্ব কলকাতার জলাভূমির। এই জলাভূমির বিশেষত্বই শহরের অশোধিত বর্জ্য জল ব্যবহার করে মাছ চাষ করা যার ফলে বর্জ্য জলও শোধিত হয়। সমস্যা শুধু পূর্ব কলকাতার জলাভূমি নয়, দক্ষিণ পশ্চিম কলকাতার মুদিয়ালির মাছের ভেড়িগুলি একইভাবে ব্যবহার করে ঐ অঞ্চলের শিল্পের বর্জ্য জল। প্রকৃতপক্ষে গার্হস্থ্য বর্জ্য জলে মাছের চাষ বর্জ্য জল শোধনের একটি নিখরচায় চিরাচরিত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা এক ধরনের বর্জ্য পুনর্ব্যবহার ও পুষ্টিকর পদার্থের পুনশ্চক্রায়ন।[৮] এর ফলেই রাজ্য সরকারের আমলারা পূর্ব কলকাতার জলাভূমির ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন খসড়া বিধির উপর কি নির্দিষ্ট সময়ে আমলারা তাঁদের মতামত পাঠিয়েছিলেন?

কেবল জলাভূমি নিয়ে মাথা ঘামাতে গিয়ে আমরা জলাশয়ের কথা কিছুটা ভুলে গিয়েছি। এটা অনেকটাই আমাদের পরিবেশ চিন্তায় পশ্চিমি দাসত্বের ফল। এই সংজ্ঞায় পুকুর, দীঘি সবই জলাভূমি কিন্তু এই বিধিতে দেশের লক্ষ লক্ষ পুকুর নিয়ে কোন ভাবনাই নেই। বরং বলা হয়েছে যে জলাভূমির ৫০ মিটারের মধ্যে কেবল নৌকার জেটি ছাড়া কোন কিছু নির্মাণ করা যাবে না। তাহলে পুকুরে কোন স্নানের ঘাট নির্মাণ, সংস্কার সবই বন্ধ রাখতে হবে। এছাড়া অনেক পুকুরের পাশেই রয়েছে মন্দির, তার কিছু কিছু মন্দির প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী। এদের সংস্কার ও ব্যবস্থাপনাও

নিষিদ্ধ হয়ে গেল। অনেক পুকুর, দীঘির চারপাশে চলার পথ, বাগান রয়েছে—তাদের সংস্কার উন্নয়নের কি হবে? এমন কি পুকুরে স্নানকেও কেউ পরিবেশ দূষণ বলে অভিযোগ জানালে তা গ্রাহ্য করবার ব্যবস্থা এই বিধিতে আছে। এছাড়া জলাভূমিতে কোন রকমের কঠিন বর্জ্য ফেলাও নিষিদ্ধ সুতরাং পুকুর দীঘিতে প্রতিমা বিসর্জনও এখন আইনত নিষিদ্ধ।

এরপর বিধিতে বলা হয়েছে যে জলাভূমিতে কতগুলি কাজ কর্তৃপক্ষের কাছে আগাম অনুমতি নিয়ে করা যেতে পারে। এই কাজগুলির মধ্যে রয়েছে মাছ চাষ। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষাধিক পুকুরে মাছ চাষ হয়। এর জন্য যদি সরকারি অনুমতি নিতে হয় তাহলে তা হবে আরেক লালফিতার ফাঁসের কারবার। আসলে এইসব পরিবেশ আইন/বিধি যারা করেন তাদের কাছে সুন্দর পরিবেশের ধারণা মানে মনুষ্য-বর্জিত নির্মল প্রকৃতি। আমাদের মত গরীব দেশে পরিবেশ/প্রকৃতি যে গরীব মানুষের জীবন-জীবিকার অংশ তা এই উচ্চবর্গের প্রকৃতিপ্রেমীদের সবসময় মনে থাকে না। এই রাজ্যের সরকারে যাদের এসব মনে করিয়ে দেবার কথা, তারাও এ কাজটি করেন নি বলেই মনে হয়।

তথ্যসূত্র:

১. The Statesman 07.04.2011

২.http://www.ramsar.org/cda/en/ramsar/1^7715_4000_0_accessed on May 2010

৩. Koromondy E.J, 1984, *Concepts of Ecology*, Prentice Hall of India, New Delhi

৪. Mitsch W.J & Goschlink J.G, 1986, *Wetlands*, Van Nostrand Rinhold Co, New York

৫. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৯৯৬, বঙ্গীয় শব্দকোষ পৃ: ৯৩১, সাহিত্য আকাদেমী, নতুন দিল্লী

৬. Mitsch W.J & Goschlink J.G, 1986, *Wetlands*, p-18 Van Nostrand Reinhold Co, New York

৭. Down to Earth 31 March 2011

৮. Dhrubajyoti Ghosh 2005, Ecology and Traditional Wetland Practice, Worldview, Kolkata

উমা

প্রয়াত বিজ্ঞানকর্মী শর্মিলা

গত ৩ জুলাই ২০১১, মাত্র ৫৫ বছর বয়সে দীর্ঘদিনের গণবিজ্ঞান আন্দোলনের সাথী শ্রীরামপুরের শর্মিলাদি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে তাঁর দেহের ৮০-৮৫% পুড়ে যাওয়ার ফলে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো যায় নি। তাঁর পরিবারকে আমাদের সমবেদনা জানানোর ভাষা নেই, আমরা তাঁদের সমব্যথী। আমরা তাঁকে চিরদিন মনে রাখব ।

গল্প বলা

(সুকুমার রায়ের ছড়া অনুসরণে)

রাজেশ দত্ত

“এক যে বাবা” ...“থাম না দোহাই
বাবা তো চোরের মাসতুতো ভাই।”
“তাঁর যে পাওয়ার!” ... “পাওয়ার কীসের?
বানানো কিস্‌সা, বিছের বিষের।”
“তাঁর ছিল এক ঐশী শক্তি!” ...
“ভোজবাজি খেলা কুড়োতে ভক্তি।”
“দৈব বিভূতি আনতেন সাঁই” ...
“বিভূতি কোথায়? ঘুঁটে পোড়া ছাই।”
“হাওয়া থেকে সোনা! মিছে কথা নাকি?” ...
“ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল ফাঁকি।”
“দৈবে সেরেছে কত না বাচ্ছা।” ...
“আসলে বাবার যৌন কেচ্ছা।”
“থোও না বাপু ধানাইপানাই” ...
“চুপ করো তবে, যুক্তি শোনাই।”
“যুক্তির কথা? বলবে সে কে রে?
সাঁইভক্তরা আসবেন তেড়ে।
শোকে কাঁদে নেতা-মন্ত্রী-তারকা,
বাবার কফিনে জাতীয় পতাকা।
কাগজে টিভিতে বাবার মহিমা” ...
“কত ভণ্ডামি নেই কোনো সীমা।
ভক্তি শোনে না যুক্তির বাণী,
ধর্মের নামে চলে শয়তানি।
ধর্ম গরল হোকনা প্রবল,
সইবো না এই বিষের ছোবল।
থাকবো না বসে সন্ধি করে,
বিজ্ঞান বইয়ে বন্দি করে।
এসো পথে নামি প্রতিরোধ গড়ি।
যুক্তিবাদীরা একসাথে লড়ি।”

চিকিৎসার ভুল ও কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

ভবানীপ্রসাদ সাহু

প্রতিবছর আমেরিকায় শুধু চিকিৎসার ভুলে ৪৪ হাজার থেকে ৯৮ হাজার মানুষ মারা যান এবং প্রায় দশ লক্ষ মানুষ শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। আমেরিকার মতো দেশে চিকিৎসা সংক্রান্ত সচেতনতা তুলনামূলকভাবে আমাদের মতো দেশের তুলনায় যেমন বেশি, তেমনি এ সংক্রান্ত তথ্যাদিও অনেক সুষ্ঠুভাবে রাখা হয়। সেই দেশে যদি এই অবস্থা হয়, তবে আমাদের দেশ সহ সারা বিশ্বে চিকিৎসার ভুলে প্রতিবছর যে বেশ কয়েক লক্ষ মানুষ মারা যান এবং কয়েক কোটি মানুষ চিকিৎসা থেকে উপকার পাওয়ার চেয়ে শারীরিকভাবে আরো বিপদে পড়েন তথা নতুনতর কষ্ট ও রোগে ভুগতে থাকেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। এবং এই চিকিৎসা বলতে এখানে আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা (ওয়েস্টার্ন মেডিসিন) বা তথাকথিত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার কথাই বলা হচ্ছে।

শুরুতে বলা আমেরিকার ঐ মৃত্যুর পরিসংখ্যানও এই চিকিৎসা থেকেই। প্রতি বছর সে দেশে বিপুল সংখ্যক গাড়ি থেকে রাস্তায় দুর্ঘটনাজনিত যে মৃত্যু ঘটে তার থেকেও চিকিৎসার কারণে মৃত্যুর সংখ্যা বেশি। সত্যি কথা বলতে কি, রোগের জন্য নয়, রোগ সারাতে যে সব রোগীরা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে যাঁরা চিকিৎসার জন্যই মারা যান সেই সংখ্যার হিসেবে দেখা যায় মৃত্যুর প্রধান দশটি কারণের মধ্যে ক্যান্সার ও হৃদরোগের পরেই চিকিৎসার ত্রুটিই বড় ভূমিকা পালন করেছে। অবশ্য বিভিন্ন দেশে এই ক্রম কিছুটা পাল্টায়। ভারত বা তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র যে সব দেশের বড় সংখ্যক মানুষ আধুনিক ঐ 'অ্যালোপ্যাথি' চিকিৎসার সুযোগ তুলনামূলকভাবে কম পান, সেখানে চিকিৎসার কারণে মৃত্যুর তালিকার একটু নীচের দিকেই থাকে, অন্তত ডায়ারিয়া ও শ্বাসতন্ত্রের জীবাণুসংক্রমণসহ যক্ষ্মা-টাইফয়েডের মতো অন্যান্য জীবাণুঘটিত রোগ থেকে মৃত্যুর পরে।

স্পষ্টতই এই ধরনের চিকিৎসার সুফল যেমন মানুষ পায়, তেমনি পাশাপাশি তার বিপদের ঝুঁকিও মানুষকে নিতে হয়। কিন্তু ঝুঁকি যে অনেক বেশি ও অনেক ভয়াবহ তা গ্রেট ব্রিটেনে আশির দশকের একটি পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যায়। ঐ সময় সারা দেশ জুড়ে চিকিৎসা কর্মীদের ধর্মঘট চলছিল। দেখা গেল, ঐ ধর্মঘটের সময় রোগীদের মৃত্যুহার শতকরা তিনভাগ কমে গেছিল। ইটালি ও ইজরায়েলেও একইভাবে দেখা গেছিল, দেশব্যাপী ধর্মঘটের কারণে মানুষ যখন চিকিৎসা কম পাচ্ছে, তখন রোগীর মৃত্যুহার কমেছে।

অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার কিছু তথ্য প্রমাণ থেকে দেখা যায়, হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে যাঁরা চিকিৎসা সংক্রান্ত অব্যবস্থার বা ত্রুটির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তাঁদের অর্ধেকের মধ্যেই ব্যাপারটি ঘটে অস্ত্রোপচারের কারণে, কিন্তু ঠিক তার পরের কারণ হচ্ছে চিকিৎসাগত বিপর্যয় ও রোগনির্ণয়ের ত্রুটি।

আর শুধু ওষুধের ('অ্যালোপ্যাথি' ওষুধ) কারণে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় এর মধ্যে শতকরা একভাগ প্রাণঘাতী (অর্থাৎ ওষুধের থেকে যাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে তাদের ১০০ জনের মধ্যে একজনই মারা যান, শতকরা ১২ ভাগের ক্ষেত্রে প্রাণ সংশয়ের সম্ভাবনা থাকে (লাইফ থ্রেটেনিং), ৩০ ভাগ খুবই বিপজ্জনক (সিরিয়াস) এবং ৫৭ ভাগ উল্লেখযোগ্য (সিগনিফিক্যান্ট)। আরো দেখা গেছে ওষুধের কারণে যে সব ক্ষেত্রে প্রাণসংশয়ের সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং যে সব ক্ষেত্রে খুবই বিপজ্জনক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটছে তাদের প্রায় অর্ধেকই সম্পূর্ণ এড়ানো যেত। এদের মধ্যেও অর্ধেকের ক্ষেত্রে চিকিৎসক ভুলভাবে ওষুধের নির্দেশিকা দিয়েছেন (অর্থাৎ প্রেসক্রিপশানের ভুল) আর সিকিভাগের ক্ষেত্রে ভুলভাবে ওষুধ রোগীর শরীরে প্রয়োগ করা হয়েছে।

চিকিৎসার ও ওষুধের (সব ক্ষেত্রেই আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা পদ্ধতি তথা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধপত্র) এই ধরনের ভয়াবহ সব পরিসংখ্যান এখন আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এই চিকিৎসা বা ওষুধপত্র সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া উচিত বা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে চিকিৎসার তথা রোগীর উপকারের দিকে লক্ষ্য রেখেই চিকিৎসক চিকিৎসা করেন। তা করতে গিয়ে বিপদ হয় দু'ভাবে—চিকিৎসকের অনিচ্ছাকৃত, অজ্ঞতাপ্রসূত বা অসচেতন অবহেলাজনিত ত্রুটির জন্য এবং দ্বিতীয়ত ওষুধ বা চিকিৎসার নিজস্ব কারণে অর্থাৎ চিকিৎসক যত সতর্ক ও সচেতনভাবেই দিন না কেন, তা থেকে কিছু বিপদ ঘটতে বাধ্য। উভয় ক্ষেত্রেই উপকার না অপকার—তার বিচারে রোগীর উপকারের দিকে পাল্লা ভারী বলেই বা তা ভেবেই চিকিৎসা করা হয়। আবার মুমূর্ষু রোগীর ক্ষেত্রে বা প্রাণঘাতী রোগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি নিয়েও রোগীর চিকিৎসা করা হয়, যদি রোগীকে বাঁচানো যায় এই আশায়।

এই শেষ ব্যাপারটি বহু ক্ষেত্রেই ঘটে। এর বিখ্যাত উদাহরণটি ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। শেষের কয়েকটি দিন রোগ যন্ত্রণায় কাতর রবীন্দ্রনাথ একান্ত অনুরোধ করেছিলেন অস্ত্রোপচার না করাতে। ডাঃ নীলরতন সরকারও বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধটুকু রাখতে। কিন্তু ডাঃ ললিতমোহন ব্যানার্জি অপারেশন করলেন। এবং হয়তো অস্ত্রোপচারের ধকল সহ্য না করতে পেরেই, অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ

করলেন। রবীন্দ্রনাথের অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত যিনি নিয়েছিলেন তিনি অবশ্যই চেয়েছিলেন তাঁর রোগমুক্তি। কিন্তু ঐ ৮০ বছর বয়সের একজন নিতান্তই অনিচ্ছুক রোগীর এমন ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে যান্ত্রিকভাবে চিকিৎসাবিদ্যা প্রয়োগ করার ব্যাপারটিই প্রকট হয়ে ওঠে। অস্ত্রোপচার না করলে রবীন্দ্রনাথ তুলনামূলকভাবে কম কষ্ট নিয়ে, আরো কিছুদিন হয়তো বাঁচতেন। মুস্কিল হচ্ছে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এই সীমারেখা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা দুরূহ হয়। কিন্তু আরো মুস্কিল হচ্ছে, ডাঃ নীলরতন সরকাররা যা অনুভব করেছেন, ডাঃ ললিতমোহন ব্যানার্জিরা তা করেন না।

চিকিৎসা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের এই ধরনের নানা ত্রুটি বা অসংলগ্নতা রোগীদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, বিশেষত আমাদের মতো দেশে, যেখানে প্রায়শই রোগীরা চিকিৎসকদের 'ভগবান'-এর পর্যায়ে ফেলে দেন। চিকিৎসা করানোর সময় চিকিৎসকের ওপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা রাখতেই হয়, কিন্তু যখন তা অজ্ঞভাবে বা অন্ধভাবে এবং কিছু মিথ্যা ধারণা থেকে (বা কুসংস্কার থেকে—যেমন বেশি ফিওয়ালা ডাক্তার মানেই ভালো, বেশি দামের ওষুধ মানেই ভালো বা ঝাঁ চকচকে হাসপাতালের উচ্চ মূল্যের চিকিৎসা মানেই সর্বোত্তম ইত্যাদি) করা হয় তখনই হয় মুস্কিল। আর এর সুযোগ নেয় কিছু সংখ্যক চিকিৎসক ও মুনাফালোভী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান। এই সুযোগ নিতে গিয়েও ভুল চিকিৎসার ঘটনা বাড়ে। যেমন পার্কিনসনিজম বা উচ্চরক্তচাপ—এ সব রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে রোগীর খুব একটা অসুবিধা হয় না, তার জন্য ওষুধপত্র দিয়ে চিকিৎসারও খুব একটা প্রয়োজন থাকে না, কিছু সতর্কতা বা ব্যায়াম ইত্যাদিই যথেষ্ট। কিন্তু এগুলি জানা মাত্রই কেউ যদি উদ্বিগ্ন হয়ে চিকিৎসকের বিশেষত, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে বা প্রাইভেট হাসপাতালে যথেষ্ট ফি দিয়ে দেখাতে যান, তবে বিরল দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া, প্রায় সব চিকিৎসকই একগাদা পরীক্ষা-নিরীক্ষা আর বেশ কিছু ওষুধ দিয়ে দেবেন। এই সব ওষুধের এমনই বিরূপ প্রতিক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হয় যে, রোগী বিনা চিকিৎসায় অর্থাৎ ওষুধপত্র ছাড়া থাকলেই ভাল থাকতেন। এই ধরনের অপচিকিৎসার উদাহরণ আরো আছে।

অন্যদিকে পেনিসিলিন বা টিকা হিসেবে ব্যবহৃত সেরাম থেকে শক্ হয়ে মৃত্যু, ক্লোরামফেনিকল থেকে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার মত প্রাণঘাতী রোগ, গর্ভবস্থায় করা এক্স-রে-র কারণে শিশুর লিউকিমিয়া, রক্ত গ্রহণের জন্য হেপাটাইটিস-বি বা এইডস-এর সংক্রমণ—এই ধরনের বহু ঘটনা ঘটে যেগুলি চিকিৎসার জন্যই হয় ভয়াবহ এবং সর্বোপরি প্রতিরোধযোগ্য। তবু এগুলিকে পুরোপুরি চিকিৎসার ভুল বলা যায় না, চিকিৎসার কারণে অসুস্থতা (iatrogenic disease) হিসেবেই বলা যায়, এবং এসব ক্ষেত্রে কিছু সতর্কতার অভাব, অদূরদর্শিতা ইত্যাদিই মুখ্য।

অন্যদিকে যে সংক্রান্ত পরিসংখ্যান শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছিল ঐ চিকিৎসার ভুল (মেডিক্যাল এররস) পুরোপুরিই চিকিৎসকদের, চিকিৎসা কর্মীর ভুল বা রোগ নির্ণয়ের ত্রুটির কারণে উদ্ভূত। বাঁ চোখে অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে ডান চোখে অস্ত্রোপচার, অজ্ঞান করা রোগীর রোগাক্রান্ত একদিকের পা বাদ না দিয়ে অন্য সুস্থ পা কেটে ফেলা, পেটের অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে যকৃৎ বা প্লীহা কেটে ফেলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ঘটানো (এবং হয়তো মৃত্যুও), জরায়ুর অস্ত্রোপচারে মূত্রথলি ফুটো করে দেওয়া—এগুলি পুরোপুরি শল্যবিদেরই ত্রুটি। একইভাবে বিকল্প ওষুধ থাকা সত্ত্বেও, রক্ত পরীক্ষা না করে বা রোগীকে সতর্ক না করে অক্সিফেনবুটাজোন বা ক্লোরামফেনিকল দিয়ে অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া ঘটানো, অপ্রয়োজনে বা সামান্য প্রয়োজনে অতিরিক্ত স্টেরয়েড দিয়ে রোগীর প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে বা উচ্চরক্তচাপ - ডায়াবিটিস (মেলাইটাস) ঘটিয়ে বিপদ ডেকে আনা, অকার্যকরী জেনেও ও সতর্কতা না নিয়ে গাঁটের ব্যথায় অতিরিক্ত ব্যথার ওষুধ খাইয়ে পাকস্থলীতে ক্ষত বা ফুটো সৃষ্টি করা, উচ্চরক্তচাপে বা ডায়াবিটিসে অতিরিক্ত ওষুধ দিয়ে রক্তচাপ বা রক্তের শর্করা অনেক কমিয়ে দিয়ে বিপদ ডেকে আনা—এমন কি মৃত্যু ঘটানো—এগুলি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকেরই ত্রুটি। অন্যদিকে ল্যাবরেটরিতে কারও রক্তে শর্করার মাত্রা যদি ভুলভাবে খুব বেশি দেখানো হয়—তবেও চিকিৎসক তার ওপরেই ভিত্তি করে অতিরিক্ত ওষুধ দিতে পারেন এবং বিপদ ঘটতে পারে। ব্যস্ততা, অসতর্কতা ও অবহেলায় একজনের রিপোর্ট অন্যের ঘাড়ে চাপিয়েও বিপদ ও মৃত্যু ডেকে আনা হতে পারে।

অন্যদিকে আপাতভাবে ভুল নয়, কিন্তু মূলগতভাবে চিকিৎসার ভুলেও বিপদ ঘটতে পারে। এর একটি বড় উদাহরণ অ্যান্টিবায়োটিকের, বিশেষত দামি ও সাম্প্রতিক অ্যান্টিবায়োটিকের লাগামছাড়া অতিরিক্ত ব্যবহার। বহু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও সাধারণ চিকিৎসক (আর হাতুড়ে চিকিৎসকও) মূলত ওষুধের দোকান ও কোম্পানির লাভের দিকে তাকিয়ে এই অন্যায়টি করেন। এইভাবেই দেখা যায়, শিশুর সাধারণ পাতলা পায়খানাতেই বিশাল পসারওয়ালা শিশু বিশেষজ্ঞ দামি অ্যান্টিবায়োটিকের নিদান দেন। ফলে কখনো বা এই ওষুধের জন্যই পাতলা পায়খানা বাড়তে পারে, কখনো স্বনিয়ন্ত্রণযোগ্য ডায়ারিয়া নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু বিপদ ঘটে ওষুধটির প্রতি প্রতিরোধী (রেজিস্ট্যান্ট) জীবাণুর সৃষ্টি হয়ে থাকে। ব্যাপারটি চিকিৎসকের হাত ধরেই ঘটে এবং তা আমাদের মতো দেশে এত ভয়াবহমাত্রায় পৌঁছেছে যে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগ এর জন্য বিশেষ কিছু কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু এই ধরনের পদক্ষেপ গুলিতেও অনেক ফাঁক ফোকর থাকবে। কখনো নিজের পসার রাখতে, কখনো বা রোগীকে ভালো করার মিথ্যা আশায় এই ধরনের

এলোপাথাড়ি ওযুধ ব্যবহার বন্ধ করার জন্য চিকিৎসকদের নিজস্ব বোধবুদ্ধির প্রয়োগ এবং ব্যবসায়িক অর্থগৃধ্নু মানসিকতা কমানোই বেশি দরকার।

অন্যদিকে আধুনিক যে চিকিৎসা ব্যবস্থা মানুষের জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে বিকশিত হয়েছে তারও সীমাবদ্ধতা প্রচুর। এটি পরবর্তী কালে শুধুমাত্র মুনাফার জন্য লালায়িত পুঁজিবাদী তথা নয়া সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির দ্বারা এই চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার কারণে নয়, বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের সীমাবদ্ধ প্রয়োগের জন্যও ঘটেছে। আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিক (অ্যান্টি মাইক্রোবিয়েলস) এর একটি বড় উদাহরণ; আধুনিক নানা ওযুধ ও জটিল নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রেও তা আংশিকভাবে প্রযোজ্য। বর্তমানে নিঃসন্দেহে সুনির্দিষ্টভাবে বিশেষ কিছু জীবাণু সংক্রমণের ক্ষেত্রে অ্যান্টিবায়েটিকের ইতিবাচক ও প্রাণদায়ী ভূমিকা অনস্বীকার্য। তা বাদ দিয়ে আধুনিক চিকিৎসাকে ভাবাও যায় না। কিন্তু বিপরীতে অন্য কিছু দিকও রয়েছে।

যেমন অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কার ও প্রচলনের আগেই বিশেষত উন্নত দেশগুলিতে পরিবেশের ও জীবনযাত্রার উন্নতি ঘটার ফলে জীবাণুসংক্রমণ ও তজ্জনিত মৃত্যুও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছিল। সব দেশের ক্ষেত্রেই তা হওয়া সম্ভব। যেমন আমাদের দেশে যক্ষ্মা, ডায়ারিয়া ও শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণের কারণে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু উন্নত পয়ঃপ্রণালী, উপযুক্ত পুষ্টি, স্বাস্থ্যকর বাসস্থান, শিক্ষা ও সচেতনতা—এসবের ফলেই এই ধরনের জীবাণু সংক্রমণজনিত অসংখ্য রোগ ও তজ্জনিত মৃত্যু প্রায় শূন্যের কাছাকাছি নামিয়ে আনা যায়। এই কমানোর পেছনে অ্যান্টিবায়োটিকের কোনও ভূমিকাই নেই। তবু এই ধরনের লক্ষ লক্ষ রোগীর ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করতে হচ্ছে। অথচ সম্পূর্ণ প্রতিরোধযোগ্য এই সব রোগের জন্য আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির দিকটি আমাদের দেশে অবহেলিত। যেমন যক্ষ্মার জন্য মৃত্যুর সংখ্যা আমেরিকায় ১৯০০ সালের প্রতি এক লক্ষে ১৯৯ থেকে ১৯৮০ সালে ০.৫-এ নামিয়ে আনা গেছে। এই হ্রাস শুরু হয়েছিল অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের অনেক আগে থেকেই। অথচ ২০০০ সালে সারা বিশ্বে যক্ষ্মায় মৃত্যুই ঘটেছে ১৬.৬ লক্ষ মানুষের—মূলত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। অন্যদিকে অ্যান্টিবায়োটিকের মতো অস্ত্র হাতের কাছে থাকায়, বাঁদর বা জঙ্গিদের হাতে অস্ত্র থাকার মতো, তার বিপুল অপপ্রয়োগও ঘটছে। অত্যন্ত বেদনার যে অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে এই ভূমিকা পালন করেন কিছু চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে শরীরের নিজস্ব জীবাণু ধ্বংসকারী ক্ষমতাকে কাজে না লাগিয়ে বা তাকে উন্নত না করে শুধু 'ধর তক্তা মার পেরেক'-এর মতো অ্যান্টিবায়োটিকগুলি জীবাণুকে মারে। এর ফলে তাৎক্ষণিক উপকার অবশ্যই হয়, কিন্তু দরজা খুলে যায় ভিন্নতর রোগের, নতুনতর জীবাণু সংক্রমণের এবং রেজিস্ট্যান্ট জীবাণু সৃষ্টির। নিছক মুনাফার জন্য নতুন 'ওযুধ' আবিষ্কার করার চেষ্টা এবং তাকে বিক্রি করার চরম উদ্যোগ ব্যাপারটিকে আরো ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছে দেয়।

বিষয়টি চিকিৎসার ভুলের আলোচনায় ততটা প্রাসঙ্গিক না হলেও, মূলগতভাবে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার আংশিক সীমাবদ্ধতার এবং রোগ ও তার চিকিৎসার ক্ষেত্রে সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর অনুপস্থিতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ব্যাপারটি একদিক থেকে 'চিকিৎসার ভুলই'। অন্যদিকে কি আধুনিক কি প্রাচীন বা ঐতিহ্যমণ্ডিত—কোনও চিকিৎসা পদ্ধতিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। এই সম্পূর্ণতা অর্জনের প্রচেষ্টাই মানুষের বৈজ্ঞানিক মননের বহিঃপ্রকাশ, এবং তাকে মুক্ত করা দরকার পণ্য ও মুনাফা কেন্দ্রিক মানসিকতার আচ্ছন্নতা থেকে।

আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থার গুণগতভাবে অর্জিত এই ধরনের সীমাবদ্ধতার আলোচনায় ভুল বোঝাবুঝি যাতে না হয়, তার জন্য একটি উদাহরণ অন্তত দেওয়া যায়। সেটি হচ্ছে ইনসুলিনের আবিষ্কার। এই ইনসুলিনও ডায়াবিটিস (মেলাইটাস) রোগটিকে সারায় না, কিন্তু সতর্ক ও সঠিকভাবে আজীবন প্রয়োগে রোগীকে প্রায় সুস্থভাবে বাঁচিয়ে রাখে। ইনসুলিন আবিষ্কারের পূর্বে বিশেষত কম বয়সে দেখা দেওয়া ডায়াবিটিস (জুভেনাইল অনসেট ডায়াবিটিস মেলাইটাস)-এর রোগীরা রোগ ধরা পড়ার পর তিন বছরের বেশি বাঁচত না। ১৯১৮ সালে, ইনসুলিন আবিষ্কারের মাত্র তিন বছর আগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-এর চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপক স্যার উইলিয়াম অসলার লিখেছিলেন, সর্বোত্তম চিকিৎসা দেওয়া সত্ত্বেও, একমাত্র আফিম (ওপিয়াম)-কেই অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে এই রোগটির (ডায়াবিটিসের) ক্রমশ বেড়ে চলার প্রক্রিয়াকে সীমিত করতে সক্ষম। এখন ডায়াবিটিসে আফিম দেওয়ার কথা কেউ ভাবতেও পারেন না এবং ইনসুলিন রোগটি না সারালেও, রোগীকে সুস্থ রাখা ও বাঁচিয়ে রাখার ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটিয়েছে। ভবিষ্যতে এমন একদিন হয়তো আসবে যখন এইভাবে আজীবন ইনসুলিন দিয়ে নয়, স্টেম সেল বা অন্য কোনও প্রযুক্তির সাহায্যে অগ্ন্যাশয় (প্যানক্রিয়াস) থেকে ইনসুলিনের ক্ষরণ স্বাভাবিক করে রোগটিকে প্রকৃত অর্থে সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে। এখনকার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ডায়াবিটিসে এক শতাব্দী পূর্বেকার আফিম চিকিৎসা 'চিকিৎকার ভুলই', কিন্তু তখন তা ছিল নিরূপায় চিকিৎসকের একমাত্র ভরসার স্থল।

চিকিৎসার ভুলের আলোচনা প্রসঙ্গে এই ধরনের নানা দিকই উঠে আসে—ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসকের বা চিকিৎসাকর্মীর অবহেলা ও ভুল সঠিকভাবে চিকিৎসাব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গীজনিত ত্রুটি, মানুষের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, হাজারো সতর্কতা সত্ত্বেও ব্যক্তি মানুষের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি ইত্যাদি।

তথ্যসূত্র:
(1) Clinical Pharmacology, Bennett & Brown, 2005
(2) Parks' Text Book of PSM, 2002

উমা

এবার বর্ষা কেমন হবে

বিবেক সেন

গ্রীষ্ম বিদায় নিতে না নিতেই রাজা থেকে প্রজা সবারই কপালে ভাঁজ—এবার বর্ষা ভাল হবে তো? যদি না হয়! কৃষকের চিন্তা ফসল যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে অনাহারের আশঙ্কা; ব্যাঙ্ক ঋণ শোধ করতে না পারার অপমান। মধ্যবিত্তের ভাবনা খাদ্যশস্যে টান পড়া মানে তো মূল্যবৃদ্ধি আর মুদ্রাস্ফীতি, গৃহস্থালীর বাজেট সামলাতে গলদঘর্ম। সরকারের ধারণা প্রচুর শস্য উৎপাদন হলে কৃষক ন্যায্য দাম পাবে না, তাই ভেবে রাখতে হবে রপ্তানীর বন্দোবস্ত; অন্যদিকে উৎপাদনে ঘাটতি হলে দরকার হবে আমদানির। আর শস্যের ঘাটতি হলে আঘাত হানবে দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি—গদী বাঁচানো হবে মুস্কিল। অতএব খোঁজ নিতে হয় আবহাওয়া-বিজ্ঞানীর।

বিজ্ঞানীরাও কিন্তু বসে নেই। ততক্ষণে খাতা-পেন্সিল আর কম্পুটার নিয়ে অঙ্ক কষতে বসে গেছেন আগামী বর্ষার সুলুক-সন্ধান নিতে। নাকে চশমা এঁটে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালিয়ে খুঁজে দেখছেন প্রশান্ত মহাসাগরের একটা বিশেষ অংশে—সেখানে এল-নিনোকে দেখা যায় কিনা।

যাকি খুঁজছি তাকে চিনব কি করে! স্মরণ নেওয়া যাক আবহাওয়া-বিজ্ঞানীর। শোনা যাক এল-নিনো কাহিনী। এল-নিনো হল দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের নিরক্ষীয় অঞ্চলের এক অস্বাভাবিক অবস্থা। এই অঞ্চলের পূব দিকে আছে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত পেরু রাজ্য (৮০° প.) আর পশ্চিমে আছে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে (১২০° পূ.)।

স্বাভাবিক অবস্থায় এই অঞ্চলে সমুদ্রের উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয় দক্ষিণ-পূর্ব থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে যেটা দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু নামে পরিচিত। সমুদ্রস্রোত বয়ে চলে পূব থেকে পশ্চিমে, অর্থাৎ পেরু থেকে ইন্দোনেশিয়ার দিকে। বায়ুমণ্ডলের চাপ মহাসাগরের পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্তে কম। ফলে বায়ুর উপর পূব থেকে পশ্চিম দিকে একটা বল প্রযুক্ত হওয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত সমুদ্রস্রোতকেও শক্তিশালী করে তোলে। ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ সমুদ্রস্রোত ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে স্তূপীকৃত হতে থাকে। সমুদ্রতলের উচ্চতা হয় পূর্ব প্রান্ত থেকে প্রায় ৬০ সেমি বেশি। তা হলেও কিন্তু জলের স্বাভাবিক ধর্ম অনুসারে সমুদ্রের জল পশ্চিম প্রান্ত থেকে পূর্ব প্রান্তে ফিরে যেতে পারে না শক্তিশালী হয়ে ওঠা পশ্চিমমুখী সমুদ্রস্রোতের বাধায়।

পেরুর উপকূল বরাবর অ্যান্টার্টিকা মহাসাগর থেকে আসা এক শক্তিশালী শীতল স্রোত প্রবাহিত হয় দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে। ফলে এই অঞ্চলে সমুদ্রজলের তাপমাত্রা তুলনামূলক ভাবে বেশ কম। উপরন্তু একম্যান সরণ প্রক্রিয়ার দরুণ গভীর সমুদ্রের শীতল জল উপরে উৎসারিত হয়ে উঠে এই অঞ্চলটিকে আরও শীতল করে তোলে। শীতল বায়ুর জলীয় বাষ্প-ধারণ করার ক্ষমতা কম হওয়ায় বৃষ্টিপাত হয় খুবই কম। তার ফলে পেরুর অনেকটা অঞ্চল মরুভূমিতে পরিণত হয়েছে।

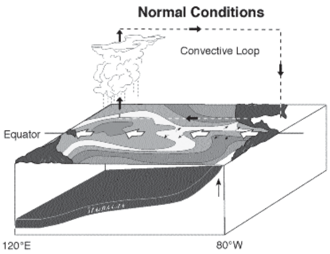

অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ার কাছে স্তূপীকৃত উষ্ণ জল এই অঞ্চলের তাপমাত্রা দেয় অনেকটা বাড়িয়ে। জলীয় বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বায়ু ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ঘটায় প্রচুর বৃষ্টিপাত। এই বায়ু ঊর্ধাকাশে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে পেরু অঞ্চলে নিচে নেমে আশে। কারণ পেরুর উপকূলে সমুদ্রতলের উপর বায়ুমণ্ডলের চাপ বেশি হওয়ায় সমুদ্রতলের বায়ু নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করতেই উচ্চস্তরের বায়ু নিচে নেমে আসে। এই বায়ু পুনরায় ইন্দোনেশিয়ামুখী বাণিজ্য বায়ুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে চক্রাকার ভ্রমণ পথটিকে সম্পূর্ণ করে (চিত্র নং ১)। চিত্রে কাল তীর চিহ্ন বায়ুর ও সাদা তীর চিহ্ন সমুদ্রস্রোতের গতির দিক নির্দেশ করছে।

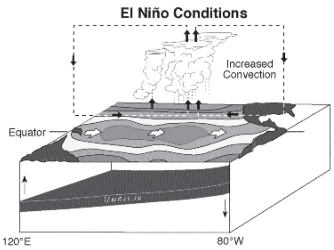

দেখা গেছে কয়েক বছর পর এই চিত্রটা বদলে গেছে। বাণিজ্য বায়ু হয়ে গেছে দুর্বল। ফলে মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তে স্তূপীকৃত উষ্ণ জল পূর্ব প্রান্তে ফিরে আসতে আর আগের মতো বাধা পাচ্ছে না। উষ্ণ জল পূর্বদিকে ক্রমশ সরে আসছে, সেই সঙ্গে ঝড় ও বৃষ্টিপাতের অঞ্চলটাও মহাসাগরের মধ্যাঞ্চলে সরে এসেছে। এই অঞ্চলের ঊর্ধ্বমুখী বায়ুর একটি অংশ ঊর্ধাকাশে আগের মতই পেরু

অঞ্চলে নেমে আসছে, অন্য অংশটি পশ্চিমমুখী হয়ে ইন্দোনেশিয় অঞ্চলে নেমে আসছে। কারণ উষ্ণ জল পূব দিকে সরে আসার দরুণ সেখানে বায়ুমণ্ডলে নিম্নচাপের জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে উচ্চচাপ, আর নিম্নচাপ অঞ্চলটি সরে এসেছে মহাসাগরের মধ্যাঞ্চলে (চিত্র নং১-এর বাঁ দিকে)। এবার সমুদ্রতলে ইন্দোনেশিয় উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু পূব দিকে প্রবাহিত হয়ে সাগরের মধ্যাঞ্চলের উর্ধ্বমুখী বায়ুর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এইভাবে চক্রাকার ভ্রমণ পথটি সম্পূর্ণ হয়েছে। ক্রমে নিম্নচাপ অঞ্চলটি পূর্বদিকে আরও সরে এসে মহাসাগরের পূর্বপ্রান্তের উচ্চচাপ অঞ্চলটিকে নিম্নচাপে পরিবর্তিত করে দেয়। পেরুর মরুভূমিতে দেখা যায় ঝড় ও প্রচুর বৃষ্টিপাত। মহাসাগরের এই অস্বাভাবিক অবস্থাকে বলা হয়েছে এল-নিনো।

মজার কথা হল এল-নিনো কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিকের দেওয়া নাম নয়। ছোট নৌকা করে সমুদ্রের উপকূলে মাছ ধরার সময় সমুদ্রের এই অস্বাভাবিক অবস্থা পেরুর নাবিকদের নজরে আসে। তারা আরও লক্ষ্য করেন যে এই অস্বাভাবিক অবস্থা সাধারণত ক্রিসমাস-এর কাছাকাছি সময়ে দেখা যায়। সেই জন্য শিশু যিশুর কথা স্মরণ করে তারা এই নামকরণ করে থাকবেন, কারণ স্পেনীয় ভাষায় এল-নিনো বোঝায় 'ছোট্ট খোকা'।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে লিমা-তে জিওগ্রাফিকাল সোসাইটি-র এক মহাসম্মেলন হয়। সেখানে নাবিকদের দেওয়া 'এল-নিনো' নামটির প্রথম উল্লেখ করতে শোনা যায়। ১৯২৩ সালে বিজ্ঞানীমহলে সমুদ্রের এই স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থার পর্যায়ক্রমে পরিবর্তনের কথা স্যার গিলবার্ট থমাস ওয়াকার প্রথম বর্ণনা করেন। যেহেতু এই পরিবর্তনটি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে লক্ষ্য করা যায় তাই তিনি এই পরিবর্তনের পর্যায়কে সাদার্ন অসিলেশন নামে অভিহিত করলেন। এর পর থেকে বিজ্ঞানীরা এই পরিবর্তনকে 'এল-নিনো সাদার্ন অসিলেশন' বলে উল্লেখ করে থাকেন।

'এল-নিনো' সূচনার প্রাথমিক লক্ষণ হল সমুদ্রের উপরিতলের গড় উষ্ণতার বৃদ্ধি। এই বৃদ্ধি কমপক্ষে ০.২৫° সেলসিয়াস এবং প্রবল 'এল-নিনো'র বেলায় এটা ১.৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে। বায়ুমণ্ডলের চাপ পশ্চিম প্রান্তে বৃদ্ধি ও পূর্ব প্রান্তে হ্রাস পেতে থাকে। ঝড়-বৃষ্টির অঞ্চল পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে সরতে থাকে। সোসাইটি দ্বীপপুঞ্জের তাহিতি (১৮ দ., ১৪৯ প.) ও অস্ট্রেলিয়ার ডারুইন (১২-৩০ দ., ১৩১ পূ.) শহরের বায়ুমণ্ডলের চাপের পার্থক্যের গড় মান থেকে বর্তমান সময়কার পার্থক্যের বিচ্যুতির সাহায্যে সংখ্যা-বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে একটি পর্যায়-সূচক (সাদার্ন অসিলেশন ইনডেক্স) নির্ধারণ করা হয়েছে। 'এল-নিনো'র আবির্ভাবে এই সূচকটির মান ঋণাত্মক হয়েথোকে।

'এল-নিনো'র বিপরীত অবস্থা হল 'লা-নিনা' অর্থাৎ 'ছোট্ট খুকি'। এটিও মহাসাগরটির একটি অস্বাভাবিক কিন্তু অস্থায়ী অবস্থা। এই অবস্থায় ঝড়-বৃষ্টির অঞ্চলটি পূর্ব দিকে না সরে ইন্দোনেশিয়ার আরো পশ্চিম দিকে সরে যায়।

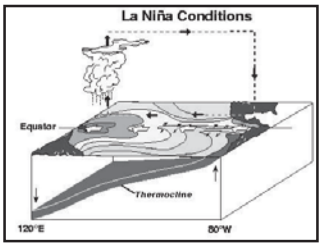

পেরু অঞ্চলে তাপমাত্রা নেমে যায় স্বাভাবিক তাপমাত্রার নিচে; স্বাভাবিক অবস্থায় যৎসামান্য যে বৃষ্টিটুকু হত, সেটারও আর দেখা পাওয়া যায় না। অন্য দিকে বায়ুমণ্ডলের উচ্চচাপ বেড়ে হয় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি। এর প্রভাবে দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমমুখী সমুদ্রস্রোতের বেগও বৃদ্ধি পায়। সমুদ্রের উষ্ণ জল ও বৃষ্টির অঞ্চল সরে যায় আরও পশ্চিম দিকে (চিত্র)। 'লা-নিনা'র আবির্ভাবে পর্যায়-সূচকটির মান হয়ে যায় ধনাত্মক।

ছোট্ট 'খোকা-খুকু'র পরিচয় তো মোটামুটি জানা গেল। তবে সরকারের তো চিন্তা বর্ষা কেমন হবে? ফসল ভাল হবে তো? কিন্তু ভারতে বর্ষা কেমন হবে সেটা জানার জন্য সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরে 'এল-নিনো' দেখা গেল কিনা সেটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা কেন হবে? এ তো ধান ভানতে শিবের গীত! আবহাওয়া পণ্ডিতদের জবাব—বর্ষার আগাম আভাস জানতে 'এল-নিনো'র পরিস্থিতি জানা জরুরি। কেননা বর্ষা নিয়ন্ত্রণকারী অনেকগুলি কারণের মধ্যে 'এল-নিনো' অন্যতম প্রধান কারণ। এরকম ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পিছনে একটা ইতিহাস আছে।

১৮৯৯ সালে বর্ষাকালে বৃষ্টির অভাবে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী খরা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। প্রলয়ঙ্করী দুর্ভিক্ষে বহু লোক প্রাণ হারান। এই ভয়ঙ্কর খরা পরিস্থিতির কারণ অনুসন্ধান করার জন্য ১৯০৪ সালে ভারতের তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার উপরোক্ত স্যার গিলবার্ট ওয়াকার-কে আহ্বান করেন। তিনি ভারতসহ নিরক্ষীয় অঞ্চলের অনেকগুলি দেশের ১৫ বছরের আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করেন। তারপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে 'এল-নিনো' আবির্ভাব হওয়ার সঙ্গে অনেকগুলি দেশের আবহাওয়ার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে—কোথাও প্রচণ্ড খরা, আবার কোথাও বা অস্বাভাবিক প্রচুর বৃষ্টিপাত। সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যে এই সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলেও কেন এমন হয় ওয়াকার তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি। গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখেই তিনি ১৯২৪ সালে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল অব অবজারভেটোরিস-এর পদ থেকে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে যান।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কিন্তু এখানেই থেমে যায় নি। ওয়াকার-এর গবেষণাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত

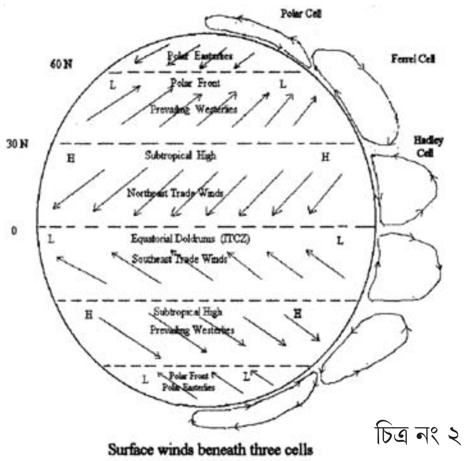

Surface winds beneath three cells of general circulation

চিত্র নং ২

বিজ্ঞানীরা তাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ১৯৬০ সালে এক বিজ্ঞানী প্রমাণ করলেন যে 'এল-নিনো'র আবির্ভাব ও তিরোভাব সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে শক্তির আদান-প্রদানেরই ফলশ্রুতি। সমুদ্রের উষ্ণ জল বায়ুমণ্ডলে তাপশক্তি সঞ্চারিত করছে, পক্ষান্তরে উত্তপ্ত বায়ু শক্তিশালী হয়ে সমুদ্রস্রোতের বেগকে দিচ্ছে বাড়িয়ে। তারপরেও প্রশ্ন থেকেই যায় প্রশান্ত মহাসাগরের 'এল-নিনো' কি করে হাজার হাজার মাইল দূরে রয়েছে যে দেশ তার আবহাওয়াকে প্রভাবিত করতে পারে? আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে এবার এই প্রশ্নের উত্তরটাও জেনে নেওয়া যাক।

সূর্যতাপ বছরের পর বছর নিরক্ষীয় অঞ্চলে বেশি ও মেরু অঞ্চলে সর্বদা কম হওয়া সত্ত্বেও আমরা জানি যে পৃথিবীর উপর প্রত্যেকটি অঞ্চলে সেখানকার গড় তাপমাত্রা মোটামুটি একই থাকে। কারণ বায়ুমণ্ডলের সাহায্যে প্রকৃতি নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ বায়ু মেরুর দিকে ও মেরুর শীতল বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত করে তাপমাত্রার সাম্যাবস্থা বজায় রাখে। নিরক্ষীয় অঞ্চলের উত্তপ্ত বায়ু ঊর্ধ্বমুখী হয়ে ঊর্ধ্বাকাশে মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়; ৩০° অক্ষাংশের কাছে এসে এই বায়ু নিম্নমুখী হয়ে ধরাতলে পৌঁছায়। এর একটা অংশ নিরক্ষরেখার দিকে, অন্য অংশটি মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়। আবার মেরুর ঊর্ধ্বাকাশের শীতল বায়ু ধরাতলে নেমে এসে নিরক্ষরেখার দিকে অগ্রসর হয়। মেরু থেকে আসা শীতল বায়ু আর নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে আসা উষ্ণ বায়ু ৬০° অক্ষাংশের কাছে মিলিত হয়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়। এই বায়ু ঊর্ধ্বাকাশে বিভক্ত হয়ে একটি অংশ ৩০° অক্ষাংশের নিম্নমুখী বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়, অন্য অংশটি মেরুর দিকে প্রবাহিত হয়ে মেরু অঞ্চলের নিম্নমুখী বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়। এইভাবে বায়ুমণ্ডলে বায়ুর তিনটি চক্রাকাব ভ্রমণপথ সৃষ্টি হয়েছে। (চিত্র নং ২) এর ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠে ৩০° অক্ষাংশ থেকে নিরক্ষরেখার দিকে বায়ু প্রবাহিত হয় উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে। এই বায়ু-প্রবাহকেই আমরা যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু বলে থাকি। মেরু অঞ্চলেও বায়ু প্রবাহিত হয় যথাক্রমে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে। মধ্যবর্তী অঞ্চলটিতে বায়ু প্রবাহিত হয় যথাক্রমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে। এই তিনটি অঞ্চলের জলবায়ুর প্রকৃতিও একটি অন্যটির থেকে ভিন্ন।

এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাণিজ্য বায়ু যে চক্রাকার পথটির একটি অংশ সেটির উৎসস্থল হল নিরক্ষীয় অঞ্চল। কাজেই সেখানকার ঊর্ধ্বমুখী বায়ু যদি দুর্বল বা নিম্নমুখী হয়ে যায় তবে পৃথিবীব্যাপী বায়ু-প্রবাহটি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এবং সেটা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের জলবায়ুর উপর একটা প্রভাব ফেলবে। তবে এই প্রভাব পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে পড়ে না। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলে এর প্রভাব একই সময়ে পড়তে দেখা যায়। কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরে উপকূলবর্তী দেশগুলিতে এর প্রভাব পড়ে ১২ থেকে ১৮ মাস পরে।

এল-নিনোর আবির্ভাবে ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়াতে গ্রীষ্মকালে সৃষ্টি হয় খরা পরিস্থিতির। অনুরূপ ভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের গ্রীষ্মকালেও (উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল) আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের দেশগুলিতেও দেখা দেয় খরা পরিস্থিতি। আগেই বলা হয়েছে যে দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে হয় অস্বাভাবিক প্রচুর বৃষ্টিপাত। পূর্ব উপকূলে কিন্তু বৃষ্টিপাত হয় স্বাভাবিকের চেয়ে কম। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শীতকালে তাপমাত্রা থাকে স্বাভাবিকের চেয়ে কম, বৃষ্টিপাত হয় বেশি। 'লা-নিনা'র আবির্ভাবে ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়াতে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত হয় বেশি।

জেনেভা থেকে বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (World Ucteordogical Organisation) ২৫ জানুয়ারি ২০১১ তারিখের বুলেটিনে জানিয়েছেন যে ২০০৯-১০ সালে যে এল নিনো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসানের পর ২০১০ জুন/জুলাই মাসে দ্রুত একটা লা নিনা পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে এবং ২০১১ সালের এপ্রিল/মে নাগাদ সেটার অবসান হতে পারে। এর প্রভাবে জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত ভারত সহ দক্ষিণ এশিয়াতে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ও তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কম থাকার সম্ভাবনা।

এ পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা গেছে ২ থেকে ৭ বছরের মধ্যে 'এল-নিনো'র পুনরার্ভিাব হতে পারে এবং সেটা ১ থেকে ২ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। এর অবসানের পরে কখনো কখনো 'লা-নিনা' পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেখা যায়—বিশেষত শক্তিশালী 'এল-নিনো' পরিস্থিতির পর। 'এল-নিনো'র পুনরার্ভিাব আবার কবে হবে তার পূর্বাভাস বিজ্ঞানীরা এখনও দিতে পারেন নি। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন গবেষণাগারে বহু বিজ্ঞানী পূর্ণ উদ্যমে এখনও সে বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। উমা

ডিওডোরান্টের ভালো-মন্দ

জয়ন্ত দাস

'দুর্গন্ধনাশক' শব্দটা শুনলে পাঠকেরা কেউ কেউ নিশ্চয়ই ভাববেন, সেটা আবার কি? বা, এরকমও ভাবতে পারেন যে নর্দমা বা ময়লা পরিষ্কার করবার কোনো বস্তুর কথাই হচ্ছে বোধহয়। কিন্তু যদি বলা যায় ডিওডোরান্ট তাহলে কিন্তু শহরবাসী মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত কারো বুঝতে অসুবিধা হবে না যে ঠিক কোন জিনিসটার কথা বলা হচ্ছে। শব্দ দুটোর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আলাদা নয়। সুতরাং শব্দের পরিচিতির কথা মাথায় রেখে আমাদের এখানে বাংলার বদলে ইংরাজি শব্দটাই বেছে নিতে হচ্ছে—আমরা ডিওডোরান্ট কথাটাই ব্যবহার করব।

ডিওডোরান্ট—সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

এই সেদিন পর্যন্ত বাংলায় ডিওডোরান্ট কথাটা, বা বলা ভালো, ডিওডোরান্ট জিনিসটাই সেরকম চালু ছিল না। আমরা জানতুম, হ্যাঁ, সেন্ট বলে একটা ব্যাপার আছে বটে, অনেকে সেটাকে একটু কায়দা করে পারফিউমও বলেন, কিন্তু গায়ের গন্ধ ঘামের গন্ধ দূর করার জন্যে যে আবার বিশেষ ধরনের দ্রব্য পাওয়া যায়, সেটা বিশেষ জানা ছিল না।

কিন্তু এখন এ জিনিসটার এমন একটা বাজার হয়ে গেছে যা এমন কি সাত-দশ বছর আগেও ভাবা যেত না। ফলে ডিওডোরান্ট বা সংক্ষেপে 'ডিও' শব্দটাও চালু হয়ে গেছে সর্বত্র। শুধু চালু হয়ে গেছে তাই নয়, সাধারণ নিম্নবিত্ত মানুষের চেতনায় এ শব্দটা একরকম প্রেস্টিজ পেয়ে গেছে। 'সেন্ট মেখেছি' বললে আর পাঁচজন মানুষের ঘাড় যতটা ঘোরে, 'ডিও মেখেছি' বললে ঘাড় ঘোরে তার চাইতে বেশি। তাই ট্রেনে বাসে পথে ঘাটে ডিও বিক্রিও হয় দারুণ। পাথুরে প্রমাণ নেই, কিন্তু আমার ধারণা যে সেসব ডিও স্রেফ পারফিউম, অর্থাৎ যাকে আগে আমরা বলতাম 'সেন্ট'। অবশ্য পাথুরে প্রমাণ থাকার উপায়ই বা কি, শিশির গায়ে তো উপাদান এসব 'ডিও'তে লেখা থাকে না। এবং সেসব 'ডিও'তে ক্ষতিকারক কিছুই নেই এমন বলা যাচ্ছে না। একটু দামি ডিও-তে অবশ্য উপাদান লেখা থাকে, তবে তাও নমো নমো করে। সে কথায় যথাসময়ে আসব।

ডিওডোরান্ট জিনিসটা তত পুরনো কিছু নয়। এই তো সেদিন, ১৮৮৮ সালে, প্রথম সাহেবদের দেশে দুর্গন্ধনাশক প্রসাধনটি এল। তার আগে পর্যন্ত সাহেব-মেমরাও ওই সেন্ট কি পারফিউম—এতেই সন্তুষ্ট ছিলেন। ইতিহাসের মজা হল যে এ সময়ের মোটামুটি ১০০০ বছর আগে, মধ্যপ্রাচ্যে বগলে দেবার জন্য দুর্গন্ধনাশক প্রসাধন চালু ছিল। কিন্তু সেটা আলাদা করে নিজস্ব নামডাক বা মর্যাদা পায় নি, আর তার চেয়ে বড় কথা হল সেটা বিক্রিবাটার বাবদে বিশেষ জাঁকিয়ে বসতেই পারে নি। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যে আবিষ্কৃত ওই দুর্গন্ধনাশক প্রসাধনটির কথা আমরা ভুলে গেছি। এমন কি ১৮৮৮ সালে যে ভদ্রলোকটি ডিওডোরান্ট আবিষ্কার করলেন, তাঁর নামটা পর্যন্ত আমি ইন্টারনেটে ঘেঁটে খুঁজে পাই নি। তবে আমেরিকায় আবিষ্কৃত এই জিনিসটি 'মাম' (Mum) এই বাজারি নামে বহুদিনে সে দেশে চলেছিল। আর ডিওডোরান্ট, বা সংক্ষেপে শুধু 'ডিও', এই নামে জিনিসটি পাশ্চাত্যে বহুপ্রচলিত হয় এই তো সেদিন, যখন বল-পেনের প্রযুক্তি কাজে লাগিয়ে ১৯৪০-এর দশকে 'রোল-অন' ডিও বাজারে আসে। তার পর নানা উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে এখন স্প্রে, লোশন, ক্রিম, স্টিক এবং রোল-অন—এ সবরকমের 'ডিও'-ই বাজারে চলছে। সবাইকে ছাপিয়ে অবশ্য স্প্রের-ই রমরমা। ক্রেতা-দোকানদাররা যাকে 'বডি স্প্রে' বলেই অভিহিত করে থাকেন। আমরা প্রথমে ডিওডোরান্ট ব্যাপারটির সামগ্রিক গুণাগুণ প্রয়োজনীয়তা বিচার করব, তার ভালোমন্দ দেখার চেষ্টা করব। তারপর স্প্রে, লোশন, ক্রিম, স্টিক এবং রোল-অন, এই সব নানাধরনের কায়দাগুলির সুবিধে-অসুবিধে দেখব।

ডিওডোরান্ট কীভাবে কাজ করে:

সাধারণত ডিও লাগানো হয় বগলে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, বগলে যেহেতু গন্ধ হয়, এবং যেহেতু বাসে-ট্রামে-অফিসে বগলের গন্ধ সবচাইতে সামাজিক লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাই সেখানকার গন্ধ ঢাকার আয়োজন। কথাটা হল, গন্ধ হয় কেন? আর গন্ধ ঢাকতে গেলে কী বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয়?

সহজতম পদ্ধতিটির কথা বলে গেছেন শরদিন্দু বন্দ্যো মশাই, তাঁর ব্যোমকেশ সিরিজের 'আদিম রিপু' গল্পে—শব্দ দিয়ে শব্দ ঢাকা, কালিপুজোর বাজির শব্দে অনাদি হালদারকে মারা গুলির শব্দ ঢাকা। তা তেমনি করেই গন্ধ দিয়েই গন্ধ ঢাকা যায়, সুন্দর গন্ধ দিয়ে বগলের প্রবল ঘামের গন্ধ চাপা দেয়া যায়। যায় বটে, তবে পুরো যায় না। আর সেক্ষেত্রে আর আলাদা করে 'ডিওডোরান্ট' বস্তুটির কি প্রয়োজন, শুধু পারফিউম দিয়েই তো কাজ চলে যায়। ডিওডোরান্টে তাই পারফিউম থাকে তবে তার সঙ্গে থাকে এমন জিনিস যা তার চাইতে একটু অন্যভাবে কাজ করে। ডিওডোরান্ট-এর মধ্যে জীবাণুনাশক থাকে, তাই 'ডিও' দিয়ে ঘামের জীবাণুকে মারা যায়, পারফিউম দিয়ে মারা যায় না। ডিও-র মধ্যে জীবাণুনাশক ছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকে ঘর্মরোধক,

থাকে ত্বকের ওপরকার 'অ্যাসিড-আবরণী'-টিকে রক্ষা করার জন্য যথাযথ অ্যাসিড বা অম্ল। এবং হ্যাঁ, অতি অবশ্যই থাকে পারফিউম।

পারফিউম নিয়ে আমরা এখানে বেশি মাথা ঘামাব না। শুধু বলব, যাবতীয় প্রসাধনদ্রব্যের মধ্যে পারফিউমে ত্বকে অ্যালার্জি হবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন সেন্ট, আতর ইত্যাদিকে একসাথে আমরা পারফিউম বা গন্ধদ্রব্য বলতে পারি। অবশ্য ঘরের গন্ধ দূর করার রুম ফ্রেশনারও গন্ধদ্রব্য, তবে সেটা গায়ে বা জামায় মাখা হয় না বলে আপাতত অপ্রাসঙ্গিক। গায়ে মাখার গন্ধদ্রব্যই ডিওডোরান্টে থাকে, কিন্তু কেবলমাত্র গন্ধদ্রব্যই আছে এমন জিনিসকে ডিওডোরান্ট অভিধায় ভূষিত করা যাবে না।

জীবাণুনাশক:

ডিওডোরান্টের ক্ষেত্রে যেসব জীবাণুনাশক থাকে তারা হল প্রধানত ক্লোরহেক্সিডিন, ট্রিক্লোসান, ক্লোরো-ক্রেসল, বেঞ্জাল্কোনিয়াম ক্লোরাইড। এদের ইথাইল অ্যালকোহল ও জলে দ্রবীভূত করে জীবাণুনাশক গুণ পাওয়া যায়। কিন্তু ডিওডোরান্টের মধ্যে জীবাণুনাশক দেবার কারণটা কি? আসলে আমাদের ঘাম এমনিতে প্রায় গন্ধহীন, অবশ্য কোনো রোগে ঘামে গন্ধ হয়, আবার কিছু খাবার খেলেও ঘামে গন্ধ হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু সাধারণত ঘামে যে গন্ধটা আমাদের সবচেয়ে খারাপ লাগে তা হল ঘামের মধ্যে যে জীবাণু বাড়ে তারা ঘামের মধ্যেকার নানা জৈব দ্রব্যকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তাদের থেকে অন্য কয়েকপ্রকার জৈবদ্রব্য তৈরি করে এবং এইসব নতুন তৈরি জৈবদ্রব্যে একটা বদগন্ধ থাকে।

এই সুযোগে আর একটা কথা বলে রাখা ভাল। বগলে বা শরীরের আর কয়েকটা বিশেষ জায়গায় ঘর্মগ্রন্থিগুলির চরিত্র একটু আলাদা, এদের বলে অ্যাপোক্রিন ঘর্মগ্রন্থি। এদের থেকে যে ঘাম বেরোয় সেটাতে জৈববস্তু কিঞ্চিৎ বেশি ও অন্যরকম থাকে, জীবাণুরা সেটা থেকে বেশি দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ তৈরি করে।

জীবাণু-নাশক নিয়ে আরও দু-চারটে বেশি কথা বলতে হয়, কেন না আমাদের এ বস্তুটি সম্পর্কে অকারণ শ্রদ্ধা বড় বেশি। খামোকা জলে এক ছিপি ডেটল গুলে তাতে স্নান করে কি কাপড় ধুয়ে অনেকেই মনে করেন—জার্মের বাবাও এবার কাছে ঘেঁষতে সাহস পাবে না। এমন ধারণাটি বলা বাহুল্য, পুরোপুরি ভিত্তিহীন। সে যা হোক, সমস্যা হল জীবাণুনাশক বিরল ক্ষেত্রে ত্বকে জ্বালা করতে পারে এবং অ্যালার্জি হবার অল্প সম্ভাবনাও থাকে। ডিওডোরান্টে যে জীবাণুনাশকগুলি দেওয়া হয় তাদের থেকেও এসব বিপদ হবার সম্ভাবনা সামান্য হলেও আছে।

ডিওডোরান্টকে সামান্য আম্লিক বা অ্যাসিডধর্মী করা হয়। কারণ হল এই যে, আমাদের ত্বকের উপরিতল সামান্য আম্লিক। সেই অম্লতা অনেক জীবাণুর সহ্য হয় না, তাই স্বাভাবিক অম্লত্ব বজায় রাখাই ভালো। কিন্তু বাজারে চালু প্রায় সব গায়ে মাখা সাবান হল ক্ষারধর্মী, ফলে সাবান দিয়ে স্নান করার পরে আমাদের ত্বকের স্বাভাবিক অম্লতা চলে যায়—ফলে অনেক জীবাণু বাড়তি সুবিধে পেয়ে যায়। এদেরই অনেকে বগলের ঘামের দুর্গন্ধের জন্য দায়ী। সুতরাং ডিওডোরান্টকে সামান্য অম্লধর্মী করা কার্যকরী।

অবশ্য পাড়ার দোকানে অনামী ব্র্যাণ্ডের ডিও-তে এসব জিনিস সব থাকে এমন সন্দেহ মনে না রাখাই ভাল। ঠিক কী কী যে থাকে সেটা জানার কোনো উপায় নেই, তাই সেগুলো কতটা নিরাপদ সে সন্দেহ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। আরেকটা ফ্যাচাং হল শপিং মল থেকে ফুটপাথ সর্বত্র 'প্রাকৃতিক, ভেষজ, অতএব নিরাপদ' মার্কা ডিও-র বিক্রিবাটা ক্রমেই বাড়ছে। অথচ এই জিনিসগুলো সত্যিই প্রাকৃতিক কিনা তা জানার কোনো উপায় নেই, যে সব উপকরণ দিয়ে তৈরি বলে দাবি করা হয় কোনো ল্যাবরেটারিতে তা পরীক্ষা করে প্রমাণ বা অপ্রমাণ করা যাবে না, এবং সর্বোপরি 'প্রাকৃতিক, অতএব নিরাপদ' কথাটির কোনো ভিত্তি নেই, বিছুটি পাতা বা সাপের বিষ 'প্রাকৃতিক' জিনিসই।

ঘর্মরোধক:

এবার ডিওডোরান্টে থাকা ঘর্মরোধকের বিষয়ে আসা যাক। সব ডিওডোরান্টে ঘর্মরোধক নেই, কিন্তু নামী-দামি ডিওডোরান্টে আছে, অন্তত থাকার কথা। কারণটা বোধ করি এই যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ এজেন্সি, সংক্ষেপে এফ ডি এ ঘর্মরোধক আছে এমন ডিওডোরান্টকে ছাড়পত্র সহজে দিতে চায় না। এবং সারা পৃথিবীতেই এফ ডি এ-র এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা আছে। যে ঘর্মরোধকটি ডাক্তারি ত্বকবিদ্যার বইগুলিতে গৃহীত সেটি হল অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড-এর ১০ থেকে ২০ শতাংশ দ্রবণ। এটা প্রমাণিত সত্য যে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড-এর দ্রবণ ঘর্মগ্রন্থিকে আস্তে আস্তে নিস্তেজ করে দেয়, ঘাম বেরোনো কমে যায়। কিন্তু এটা এক্রিন ঘর্মগ্রন্থির ক্ষেত্রে যতটা পরীক্ষিত সত্য, অ্যাপোক্রিন ঘর্মগ্রন্থির ক্ষেত্রে ততটা পরীক্ষিত নয়। পাঠকের বোধ করি মনে আছে যে বগলের দুর্গন্ধের জন্য অ্যাপোক্রিন ঘর্মগ্রন্থি নিঃসৃত ঘামই বেশি দায়ী, এবং এক্রিন ঘর্মগ্রন্থির গঠনটা একটু আলাদা। তাছাড়া আরেক ভাবেও অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড কাজ করে। জীবাণুরা যে দুর্গন্ধযুক্ত বস্তুগুলি তৈরি করে তাদের অনেকের মধ্যেই থাকে অ্যামোনিয়া ঘটিত পদার্থ। অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এই সব পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়া করে তাদের অপেক্ষাকৃত গন্ধহীন রাসায়নিক পদার্থে পরিণত করে। প্রসাধন শিল্পে ঘর্মরোধক হিসেবে জারকোনিয়াম ক্লোরাইড-এর দ্রবণও চলে। এ যৌগটি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডের মতো অত বেশি পরীক্ষিত নয়, কিন্তু সাধারণ মত হল যে এটি প্রায় একই রকমের কার্যকরী।

অবশ্য ব্যাপারটা একটু অন্যরকমভাবে ভাবা যেতে পারে। অ্যাপোক্রিন ঘর্মগ্রন্থির ঘাম থেকেই জীবাণুরা বেশি দুর্গন্ধযুক্ত দ্রব্য তৈরি করে বটে, তবু সাধারণভাবে ঘামের পরিমাণ কমলেও

জীবাণুর বাড়বাড়ন্ত কমে, ফলে দুর্গন্ধও কিছুটা কমে। আর যদি আমরা ঘামের জন্যে যে অস্বস্তির কথা ভাবি, সেটা কিন্তু এক্রিন ও অ্যাপোক্রিন দু'রকম ঘর্মগ্রন্থির জন্যই সমান। সুতরাং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড বা জারকোনিয়াম ক্লোরাইড দুই-ই আমাদের আরাম দেয়।

স্প্রে, লোশন, ক্রিম, স্টিক এবং রোল-অন:

প্রথমদিকে ডিওডোরান্ট তরল দ্রবণটি সরাসরি চামড়ার ওপর লাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো বিশেষ কায়দা আবিষ্কৃত হয় নি। ১৯৫০-এর দশকে বল-পেনের প্রযুক্তি ব্যবহার করে 'রোল-অন' কায়দায় ডিওডোরান্ট শিশি এল, এবং সেটা বেশ ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াল। ওই দশকেই এল ডিওডোরান্ট স্প্রে এবং ষাটের দশক থেকে সত্তরের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত ছিল স্প্রে-র রাজত্ব। কিন্তু সত্তরের দশকে দুটো সমস্যা মাথা চাড়া দিল। প্রথমত, স্প্রে করলে যে জারকোনিয়াম বেরোয় তার কিছুটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরে ঢুকতে পারে এবং জারকোনিয়ামের নিরাপত্তা সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা। এ ছাড়া স্প্রে করলে ডিও-র নানা জিনিসে যাদের নাকের বা শ্বাসনালীর অ্যালার্জি আছে তাদের হাঁচি বা শ্বাসকষ্ট হবার সম্ভাবনা রোল-অন ইত্যাদির চাইতে বেশি। দ্বিতীয়ত, স্প্রে করতে গেলে যে ক্লোরোফ্লুরো কার্বন বেরোয় তা মহাকাশের ওজোন স্তরে ফুটো করে দিচ্ছে, এ ব্যাপারটাও তখন জানা গেছে, ফলে স্প্রে তৈরিতে অনেক রকম সরকারি বিধিনিষেধের জাল তৈরি হল। তাতে ডিও প্রস্তুতকারী বা ক্রেতা কারও কিছু এসে যাচ্ছে না। জন আব্রাহাম থেকে তাবৎ মডেলকে বিজ্ঞাপনে ডিও স্প্রে ব্যবহার করতে দেখে অল্পবয়সীরা হামলে পড়ছে বডি স্প্রে-র ওপর। ফ্যাশন ব্যাপারটাই টিকে থাকে 'অন্যের থেকে আলাদা হয়ে ওঠা'-র মধ্যে। তাই বিভিন্ন কায়দা—ক্রিম, লোশন এবং গায়ে ঘষার স্টিক—এসব বাজারে আসছে 'পাবলিক খাচ্ছে'।

শেষের কথা, কিন্তু সত্যিই যদি শেষ কথা হত:

ডিওডোরান্ট মাখতেই পারেন, তবে মনে রাখবেন হাতে বা জামাকাপড়ে 'ডিও' ঘষার যে ফ্যাশনটি চলে সেটি খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়, মাখতে হলে ওসব জায়গায় সেন্ট তথা পারফিউম মাখলেই ভালো। আর হ্যাঁ, দামি ডিওডোরান্ট মানেই ভাল, তা নয়, এমন কি দামি ডিওডোরান্টটিই হয়ত বা আপনার পক্ষে বেশি অসুবিধাজনক হতে পারে। কেন না যে পারফিউমে আপনার অ্যালার্জি আছে সেটি দামি-কমদামি যে ডিওডোরান্টেই থাকুক না কেন, মাখলে আপনার অ্যালার্জি হবে। গায়ে লাগানো হয় এমন কোনো জিনিসে অ্যালার্জি বোঝার জন্য ডাক্তারের প্রয়োজন সাধারণত হয় না, সেটি মাখলে যদি আপনার চুলকোয় তাহলে বুঝবেন খুব সম্ভব আপনার ওই ডিওডোরান্টে অ্যালার্জি হয়েছে এবং সেটা সাধারণত ডিওডোরান্টের মধ্যে থাকা পারফিউমটির জন্যই। হাঁচি ও শ্বাসকষ্টও অ্যালার্জির লক্ষণ হতে পারে। ঘর্মরোধক দ্রব্যটিতে বা জীবাণুনাশকে বিরল ক্ষেত্রে ত্বকে জ্বালা করতে পারে এবং অ্যালার্জিও হতে পারে, তবে তার সম্ভাবনা কম। সে যাই হোক, কাজের কথাটা হল একবার কোনো ডিওডোরান্ট মাখার পর চুলকালে বা হাঁচি শ্বাসকষ্ট হলে সেটা আর মাখবেন না, অন্য ডিওডোরান্ট ব্যবহার করুন। তাতেও যদি এসব অসুবিধে থেকে যায় তো ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। হয়ত তিনি ডিওডোরান্ট ছাড়াও অন্য কোনো কারণ দেখতে পাবেন, হয়ত তিনি আপনাকে অনেকটা অন্য রাসায়নিক দিয়ে তৈরি কোনো ডিওডোরান্টের কথা বলতে পারবেন। তবে মনে রাখবেন, এত করেও শেষরক্ষা না-ও হতে পারে, সে ক্ষেত্রে আপনাকে 'ডিও' ব্যবহার বন্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না।

তাতে তেমন দুঃখ হলে মনে মনে ভেবে সান্ত্বনা খুঁজে পেতে পারেন যে বলাও যায় না, এতে হয়ত আপনার শাপে বরই হয়ে গেল। ভীমরতি ধরা বা ডাক্তারি ভাষায় যাকে অ্যালঝাইমার-এর রোগ বলে সেটার সঙ্গে ঘর্মরোধক হিসেবে ব্যবহৃত অ্যালুমিনিয়াম যৌগের সম্পর্ক আছে এমন সন্দেহ কেউ কেউ আজও পোষণ করেন, যদিও প্রমাণ বলতে তেমন কিছু নেই। এবং কেউ কেউ এমন ধারণাও পোষণ করেন যে বগলে ঘর্মনাশক স্তন-ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়াতে পারে। তবে এগুলি ধারণামাত্র, এবং তথ্য-প্রমাণ এখনো পর্যন্ত যেটুকু যাচাই করা গেছে তাতে মনে হয় এ সব ধোপে টেকে না।

শিবঠাকুরের আপন দেশে:

নিশ্চিন্ত হবার কি যো আছে? এই দেখুন না, লেখার শেষে দু'চারটে নামকরা দামি ডিওডেরান্টের শিশি নিয়ে বসেছিলাম মিলিয়ে নিতে। কিমাশ্চর্য্যম, অনেক উপকরণ লেখা হয়েছে এত সংক্ষেপে যে তাতে কেমিক্যাল কি কি আছে আপনি বুঝতেই পারবেন না। যেমন একটি অতি নামি ডিও স্প্রে-র শিশিতে উপকরণ লেখা আছে 'পারফিউম', ব্যাস, সেটা যে কি কেমিক্যাল তা বুঝবার উপায় নেই। অবশ্য পারফিউমের ব্যাপারে একটা ট্রেড সিক্রেট থাকে, সেটা ভাল কি মন্দ সে কথা আলাদা। কিন্তু সেই নামি ডিও-র স্প্রের শিশিতেই লেখা রয়েছে 'প্রোপেলেন্ট', অর্থাৎ স্প্রে করার জন্য কিছু একটা। সেই 'কিছু একটা'টা মহাকাশের ওজোন স্তরে ফুটো করে দেওয়া ক্লোরোফ্লুরোকার্বন—এমনটাই সন্দেহ হয়। এবং কিমাশ্চর্য্যম্ কিমাশ্চর্য্যম! এতো দামি ডিও-তে কোনো ঘর্মরোধক দ্রব্যই নেই! ডিও বলে যে জিনিসটি বড় বহুজাতিক কোম্পানির খাসা প্যাকেটে কিনছেন সেটা স্রেফ সেন্ট আর বীজাণুনাশক। আমেরিকার এফ ডি এ ঘর্মরোধক আছে এমন ডিওডোরান্টকে ছাড়পত্র সহজে দিতে চায় না বলে কোম্পানি সস্তায় বাজিমাত করেছে।

বাজারে চালু এবং নামি-দামি দু-একটা ডিওডোরান্টের শিশির গায়ে লেখা কয়েকটি রাসায়নিকের নিরাপত্তা নিয়ে কিছু কথা বলে

সিদ্ধান্ত টানবার চেষ্টা করব। সত্যি কথা বলতে কি, এই ব্যাপারটা নিয়ে লেখার যোগ্যতা আমার ততটা নেই, একজন শিল্প-রসায়নবিদ আমার চাইতে ভাল বলতে পারতেন। তবু কিছু কথা বলা দরকার কেন না বড় রকমের কোনো জ্ঞাত বিপদ আছে কিনা এবং থাকলে তা কোন দিক দিয়ে আসতে পারে, সে ব্যাপারে প্রাথমিক কিছু কথা এখানেই বলে রাখা জরুরি। তবে এ ধরনের প্রায় সমস্ত ব্যবহার্য বস্তু সম্পর্কে এ কথাটা মনে রাখা উচিত যে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে পরীক্ষা সাধারণভাবে অপ্রতুল। সুতরাং এমনটা হতেই পারে যে আমার লেখার এই অংশটুকুতে পাঠকেরা কিছু ভুল বা অসম্পূর্ণতা খুঁজে পাবেন।

একটি নামি কোম্পানির ডিওডোরান্টের শিশির গায়ে লেখা অনুসারে, তার মধ্যে আছে বিউটেন, আইসো-বিউটেন, প্রোপেন, সাইক্লোমেথিকোন, ডাইমেথিকোনল, সাইক্লোপেন্টাসিলোক্সেন, পি পি জি ১৪ বিউটাইল ইথার, কোয়ার্টারনিয়াম-১৮, আছে অক্টাইলডোডেনল ইত্যাদি ইত্যাদি। বিউটেন ও আইসো-বিউটেনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত তথ্য দেখা যাক। এ দুটিই ডিওডোরান্ট স্প্রে করার প্রোপেল্যান্ট হিসেবে কাজ করে। ভাল ব্যাপার, কেন না ওজোন স্তরে ফুটো করা ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ব্যবহার করতে হচ্ছে না। কিন্তু বেশি মাত্রায় বিউটেন শরীরে গেলে তা ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে। প্রথমে মানসিক প্রভাব, যেমন বাজে বকা, এবং আরও বেশি মাত্রায় গেলে হৃদযন্ত্রের ওপর প্রভাবে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। সাধারণ ব্যবহারে এসব হবার আশঙ্কা নেই ঠিকই, কিন্তু ওই শিশি শিশুর কাছে মৃত্যুদূত হয়ে দেখা দিতে পারে।

এছাড়া ওই একই ডিওডোরান্টে আছে সাইক্লোমেথিকোন। এটি এক ধরনের সিলিকোন জাতীয় রাসায়নিক, এখনও পর্যন্ত এটিকে মোটের ওপর নিরাপদ বলেই ধরা হয়। আছে সাইক্লোপেন্টাসিলোক্সেন, আরেকটি সিলিকোন জাতীয় রাসায়নিক, এখনও পর্যন্ত এটিকেও মোটের ওপর নিরাপদ বলে ভাবা হয়। ডাইমেথিকোনল হল আরেকটি সিলিকোন জাতীয় রাসায়নিক, এটিকেও মোটের ওপর নিরাপদ বলে ভাবা হয়। আছে পি পি জি ১৪ বিউটাইল ইথার, যে দ্রব্যটি অনেক প্রসাধন দ্রব্যে ব্যবহার করা হয়, এবং মোটের ওপর নিরাপদ। রয়েছে কোয়ার্টারনিয়াম-১৮, যা এমনিতে ঠিক আছে, কিন্তু চোখে গেলে বিপজ্জনক। অক্টাইলডোডেকানল এমনিতে চোখ, ফুসফুস বা ত্বকের সামান্য জ্বালাভাব ঘটাতে পারে, কিন্তু এর মূল সমস্যা হল যে এটি সহজে ভেঙ্গে যায় না, ফলে মানুষের শরীরে, খাদ্য-শৃঙ্খলে ও পশু-পাখির দেহে বছরের পর বছর ধরে এটি জমতে পারে, পরিবেশে তার ফলাফল অনিশ্চিত, সম্ভবত ক্ষতিকর।

আরেকটি নামি-দামি কোম্পানির ডিওডোরান্টে আছে প্রোপিলিন গ্লাইকল, ট্রিক্লোসান, এবং আগের ডিওডোরান্টটিতে যে সব রাসায়নিক দ্রব্যের কথা বলা হয়েছে তাদের অনেকগুলি। প্রোপিলিন গ্লাইকল দ্রাবক হিসেবে কার্যকরী, কিন্তু এতে কারো কারো অ্যালার্জি হতে পারে। ট্রিক্লোসান বীজাণু এবং ছত্রাকনাশক হিসেবে বেশ কার্যকরী, বীজাণুনাশক সাবান ও টুথপেস্টে এর ব্যবহার আছে। কিন্তু আমেরিকার এফ ডি এ আপাতত এর ব্যবহারের ওপর নজর রাখছে, কেন না পরিবেশের ওপর এটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া করতে পারে।

এ ছাড়া আগেই যেমন বলেছি, অনেক ডিওডোরান্টের শিশির গায়ে লেখা আছে 'পারফিউম', তাতে জিনিসটি যে কি তাই বোঝা যায় না তো তার নিরাপত্তা-অ-নিরাপত্তা! অনেক উদ্ভিজ্জ জিনিস আছে, তাদের ক্ষেত্রেও ওই সমস্যা—আমরা সত্যিই জানি না জিনিসটাতে ঠিক কি আছে আর তা কতটা নিরাপদ।

সুতরাং সিদ্ধান্ত নেবার আগে ভেবে দেখতে পারেন, ডিওডোরান্ট ছাড়াও আপনি দিব্যি থাকতে পারেন, যদি না আপনার গরমকালে বহুক্ষণ এক জামাকাপড়ে থাকার দরকার পড়ে, অথবা আপনার বেশি ঘাম হয় ও সহজেই ঘামের দুর্গন্ধ হয়। মোটামুটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকাই সাধারণত যথেষ্ট।

বিজ্ঞানের বাইরে কিছু (এলোমেলো) কথা:
প্রসাধন বাজারটার নীতি, বা বলা ভাল, নীতিহীনতা এমন যে ক্রেতা হিসেবে আপনার না ঠকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা খুব কম। তাছাড়া বড়সড় রঙচঙে টিনের কৌটোয় ১০০ বা ১৫০ এম এল মেশানো অ্যালকোহলের জন্য কতটা গাঁটগচ্ছা যায় সেটা নিয়েই বা কে ভাবে। এর সহজ কারণ হল প্রসাধন শেষ বিচারে যা বিক্রি করে তা হল আপনার ভাল লাগা। ভাল লাগাটা প্রসাধনের ব্যবসায়ীরা নিজেরাই নানা বেশে ও ছদ্মবেশে তৈরি করে নেয়, বিজ্ঞাপন, ফ্যাশন, সামাজিক চাপ, সাংস্কৃতিক প্রভাব-বলয় এসব নানা কায়দায়। একা মানুষ এর পাল্টা সংস্কৃতি তৈরি করতে পারে না। তাই ক্রমশ মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে।

ডিওডোরান্টে সত্যিই কি আপনার দরকার আছে? এ প্রশ্নটাই ক্রমশ অর্থহীন হয়ে যায়, যেতে থাকে, কেন না আপনি তখনই একটা আস্ত মানুষ যখন অন্যদের চাইতে আপনি বেশি সক্ষম, বেশি এগিয়ে, বেশি চকচকে, বেশি সুরভিতও।

উমা

ভুল শুধরে নেওয়া

গত (এপ্রিল-জুন ২০১১) সংখ্যায় 'এখনো গেল না আঁধার' নিবন্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভুল হয়েছে। ১৮ পাতায় প্রথম কলমে 'গড্ডলিকা' হবে, গড্ডালিকা নয়। ঐ পাতায় দ্বিতীয় কলমে তথ্যসূত্র অংশে: Ramananda Chatterjee ও 1931 হবে, Rammohan Chatterjee ও 1991 নয়। ত্রুটি আমাদের, মার্জনা করবেন।

সম্পাদক

বেপরোয়া বনবিহারী

সমীরকুমার ঘোষ

বেদ স্বয়ং ব্রহ্মার মুখ থেকে নিঃসৃত বাণী। সুতরাং অভ্রান্ত। এই মতের জোরালো প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যখন চলছে যাগযজ্ঞ, স্বর্গ-নরক, ইহকাল-পরকাল তত্ত্বের রমরমা, সেই সময়েই প্রবল বিরোধী শক্তি হয়ে মাথা তুলেছিল চার্বাক দর্শন। এই দর্শনে বাক্যের প্যাঁচ মেরে সব কিছু গুলিয়ে দেওয়ার কোনো চেষ্টা ছিল না। যুক্তিগুলো ছিল সোজাসাপ্টা, তীক্ষ্ণ বর্শার মতো। তাতে বলা হত---পৃথ্বী, জল, তেজ ও বায়ু---দেহাকারে পরিণত এই ভূতচতুষ্টয় থেকেই চৈতন্যের উৎপত্তি। তিন শ্রেণীর ব্যক্তি বেদ রচনা করেছে—ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর। যুক্তি ছিল—যজ্ঞে পশুবলি দিলে সে পশুর নাকি স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। তাহলে নিজের বাপকে ধরে কোতল করে দিলে তো অতি সহজেই তাঁকে স্বর্গে পাঠানো যায়! এ জাতীয় নানা যুক্তি-তর্কের ওপর গড়ে-ওঠা লোকায়ত দর্শনকে 'ঋণ করে ঘি খাও' বাক্যটার মধ্যে পুরে নস্যাৎ বা লঘু করে দেওয়ার সযত্ন প্রয়াস চলেছে। যুক্তিবাদের জায়গায় চার্বাক দর্শন হয়ে উঠেছে ভোগ-দর্শন। চার্বাক বলে কেউ একজন ছিলেন কি না তা নিয়ে বিস্তর তর্ক আছে। তবে চার্বাককে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল, এমন কাহিনীও আছে। অমন ঘোরতর বিরোধীকে পুড়িয়ে মারা ছাড়া আর কীভাবেই বা নিবৃত্ত করা যেত! তবে ঘটনা হল, চার্বাকরা ওইভাবে মরেন না। নানা যুগে, নানা দেশে, নানা নামে তাঁরা হাজির হন, একেবারেই 'সম্ভবামি যুগে যুগে'-র কৃষ্ণের মতো! বিংশ শতাব্দীর তেমনই এক বিদ্রোহী চার্বাকের নাম ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। উনি ছিলেন লুপ্তপ্রায় দরদী চিকিৎসক-কুলের উজ্জ্বল প্রতিনিধি আর সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপসহীন যোদ্ধা।

অনেক দিন আগে বরুণকুমার চক্রবর্তীর লেখা বই 'সাহিত্য সমীক্ষা'য় 'বিগত দিনের একটি বিস্মৃত পত্রিকা' নামে একটি প্রবন্ধ ছিল। লেখাটি 'বেপরোয়া' নামে একটি পত্রিকাতে। এই পত্রিকাটি ১৩২৯ সালে চালচলন থেকে বিষয়বস্তু—সব কিছুতেই একটা বেপরোয়া মনোভাব নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিল। সম্পাদক ছিলেন কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য। তিনি ছাড়া আরও তিনজন লেখক ছিলেন পত্রিকার। যাঁদের নাম চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, তুলসীচরণ ভট্টাচার্য এবং বনবিহারী মুখোপাধ্যায়। এর মধ্যে তুলসীচরণ ও বনবিহারী ছিলেন চিকিৎসক। সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস অবশ্য চারুচন্দ্র, বিষ্ণুচরণ ও বনবিহারীকে 'তিন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ' বলে উল্লেখ করেছেন। বেপরোয়া সম্পর্কে আত্মস্মৃতি-তে তিনি লিখছেন---'আমাদের সামাজিক এবং অন্য বহুবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানসম্মত সাহিত্যিক আন্দোলন তুলিয়াছিলেন ১৩২৯-৩০ বঙ্গাব্দে তিন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ—ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য 'বেপরোয়া' নামক অসাময়িক পত্রিকায়। যে বিপ্লব ও বিদ্রোহের ধুয়া ইঁহারা এই চটি সচিত্র পত্রিকায় তুলিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া রাখিবার মত, তাহার তুলনা হয় না।'

বরুণবাবু তাঁর বইতে বেপরোয়া পত্রিকাটির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছেন। এই লেখাটি থেকেই জানতে পারি বনবিহারীর নাম। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটির প্রাণস্বরূপ ছিলেন তিনিই। বনফুলের বিখ্যাত উপন্যাস 'অগ্নীশ্বর' এঁকে নিয়েই লেখা। বনফুল যখন মণিহারীতে থাকতেন, বনবিহারী তখন কাটিহারে রেলওয়ে মেডিকেল অফিসার ছিলেন। তাঁর চিকিৎসক বাবা কখনও কখনও 'কন্সাল্ট' করার জন্য বনবিহারীকে 'কল' দিতেন। তখনই তাঁর সঙ্গে বালক বনফুলের পরিচয়। পরে মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় বনবিহারীকে পান শিক্ষক হিসাবে। পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। বনফুল ডাক্তার হওয়ার পরও তাঁদের সম্পর্ক অটুট থেকে যায়। ব্যতিক্রমী মানুষটি প্রবলভাবে আকর্ষণ করে তাঁকে। ছাপ ফেলে সাহিত্যিক মনে। তাই অনন্য মানুষ বনবিহারীকে ধরতে চেষ্টা করেন অগ্নীশ্বরের মধ্যে। কবি-কল্পনার মিশেল সত্ত্বেও বনবিহারীকে চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। টের পাওয়া যায় বনফুল তাঁর শিক্ষা ও দীক্ষাগুরুকে কী চোখে দেখেছেন। কাহিনীর প্রারম্ভিক ছত্রেই অগ্নীশ্বর বনবিহারীর চরিত্রটি প্রাঞ্জল রূপে ধরা পড়ে। বনফুল লিখছেন—

'ডাক্তার অগ্নীশ্বর মুখোপাধ্যায় সার্থকনামা ব্যক্তি। জানি না এখন তাঁহার চেহারা কেমন আছে, কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্বে তিনি দেখিতে মূর্তিমান অগ্নিশিখার মতোই ছিলেন, যেমন উজ্জ্বল, তেমনি প্রখর। কিন্তু অগ্নির সহিত তাঁহার সাদৃশ্য ওইখানেই শেষ হইয়াছে। তাঁহার বাহিরের খোলসটার অন্তরালে, তাঁহার মর্মভেদী ব্যঙ্গতীক্ষ্ণ তীব্রতার নেপথ্যে যে স্নেহাতুর আদর্শবাদী ন্যায়পরায়ণ পরার্থপর সত্তাটি ছিল লেলিহান অগ্নিশিখার তাহা থাকে না। তাঁহার এই সত্তাটি কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই নয়নগোচর হইত না। তিনি

যখন কাহারও হৃদয় বা মস্তক লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিতেন, তখন সে বেচারীর মনে রাগ ছাড়া অন্য কোনও ভাবোদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত না। তিনি অন্য ভাবোদ্রেক করিতে চাহিতেনও না। লোকে যেমন মশা, ছারপোকা, সাপ ব্যাঙকে ঘর হইতে তাড়ায়, তিনি তেমনি অধিকাংশ লোককে নিজের সান্নিধ্য হইতে বিতাড়িত করিতেন। কোনও প্রকার বোকামি, গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, ন্যাকামি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রায়ই বলিতেন—বাইবেলে পড়েছি মানুষের মুখে একটা বিভাইন (Divine Look) আছে, কিন্তু আমি তো বোভাইন লুক (Bovine look) ছাড়া আর কিছু দেখিতে পাই না। তার সঙ্গে পেজোমিরও মিশেল আছে। সব বোকা বদমাইসের দল।'

এই 'অগ্নীশ্বর'-কে নিয়ে পরে ছবি করেছিলেন বনফুলেরই ভাই অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। মহানায়ক উত্তমকুমার অসাধারণ নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন অগ্নীশ্বরের চরিত্রটিকে। যদিও ছবিটি যথোচিত সমাদর পায় নি। বনফুল তাঁর আত্মচরিত 'পশ্চাৎপট'-এ এই ছবিটির কথা উল্লেখ করে বেজায় চটে গিয়ে লিখেছিলেন— 'ঢুলু আমার 'অগ্নীশ্বর' বইখানি চলচ্চিত্রে রূপায়িত করিয়াছে। বইটি রসিকমহলে খুব সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে। এদেশে গাঁয়ে-মানে-না-আপনি-মোড়ল গোছের কয়েকটি স্বয়ম্ভু প্রাইজদাতা প্রতিষ্ঠান আছেন, তাহাদের সভ্যেরা তদ্বির-প্রভাবিত, স্তাবক-তোষক সবজান্তা জাতীয় লোক। 'অগ্নীশ্বর' তাঁহাদের প্রসংসা লাভ করিতে পারে নাই। শৃগাল, কুক্কুর, গরু, ভেড়ারাও বইটি সম্বন্ধে নীরব। দেশের রসিক সমাজ কিন্তু বইটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।'

সত্তর দশকে ছাত্রাবস্থায় সিনেমাটি দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। মনে গেঁথে গিয়েছিল আপসহীন, লড়াকু এবং একই সঙ্গে দরদী এবং মানবিক ডাক্তার অগ্নীশ্বরের চরিত্রটি। সেই অগ্নীশ্বর যে বনবিহারী মুখোপাধ্যায় তা জেনে দ্বিগুণ আকর্ষণ বেড়ে গেল। খোঁজ করতে লাগলাম বেপরোয়া এবং বনবিহারীর। বন্ধুবর সৌম্যেন পালের দৌলতে হাতে পেলাম দুষ্প্রাপ্য বেপরোয়া পত্রিকাটির কয়েকটি সংখ্যা। মিলিয়ে দেখলাম বরুণবাবুর লেখায় কিছু কিছু তথ্যগত ভুল রয়েছে। সম্ভবত তিনি সব পত্রিকা চোখে দেখেননি। পত্রিকাটির প্রচ্ছদ থেকে লেখা-রেখা, সবই ছিল প্রথাবিরুদ্ধ। যেমন পত্রিকার প্রচ্ছদেই থাকত তথাকথিত অলক্ষুনে, অমঙ্গলকর সব জিনিসের ছবি— ফণিমনসার গাছ, সাপ, ব্যাঙ, শূন্য নৌকা, শূন্য কলসী, ঝাঁটা, কাঁকড়া, শূন্য ডালে বসা কাক ইত্যাদি। আর সব ধরনের কুসংস্কারকে তীব্র কটাক্ষ আর ব্যঙ্গের কশাঘাত করাই ছিল লেখা ও রেখার উদ্দেশ্য। আশ্বিন মাসে শারদীয়া পুজো উপলক্ষে সব পত্রপত্রিকাই 'পুজো সংখ্যা' প্রকাশ করে। বেপরোয়া এদিক থেকেও ছিল ব্যতিক্রম। তারা চৈত্রমাসে 'শ্রীশ্রী ঘেঁটুরাজ'-এর পুজো উপলক্ষে প্রকাশ করেছিল 'পুজার সংখ্যা'। সেটা ছিল ১৩২৯ সালের চৈত্র মাস। তাতে চার লাইনের সংস্কৃত শ্লোক সহ ঘেঁটুর 'আবাহন' করা হয়েছিল এই বলে—'হে দেবাদিদেব, হে ঘেঁটো, একবার আমাদের সম্মুখে আবির্ভূত হও, আমরা তোমার আবাহন করি। তুমি মহান্, তুমি শক্তিমান্, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। তোমার চরণস্পর্শে বঙ্গদেশ আজ নবশোভা ধারণ করিয়াছে। আজ বসন্ত তাহার শাখা পল্লবে, বসন্ত তাহার ঘরে ঘরে। আজ শীতলার আর বিরাম নাই। তোমারই বা বিরাম কোথায়? শীতলার তবু একটা গাধা আছে, তোমার তাহাও নাই,— quack বলিয়া আজিও গাধা কিনিতে পার নাই। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইও না। এদেশে হাতুড়ের দর কম কিন্তু কদর বেশী।

তুমি পুরুষ কি নারী ঠিক করা শক্ত। বোধ হয় তোমার আধ্যাত্মিক উন্নতি বড় বেশী হইয়াছে। আমরাও আধ্যাত্মিক, তাই বাহিরের লোকে আমাদের পুরুষ বলিয়া চিনিতে পারে না। এত আধ্যাত্মিক বলিয়াই কি তুমি হাঁড়িমুখো? তবে, হে আধ্যাত্মিক, হে হাঁড়িমুখো, তোমাকে নমস্কার করি।'...

বেপরোয়া প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে, আপাতত বনবিহারীকে নিয়ে পড়া যাক।

চার্বাক মুনিকে নাকি বিরুদ্ধবাদীরা পুড়িয়ে মেরেছিল। বনবিহারীর ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। তবে ঘটতে পারত। পরিমল গোস্বামীর কথায়, 'যদি ইওরোপের রোজার বেকন বা এমনকী ভোলতেয়ারের যুগেও আমাদের দেশের আধুনিক ব্যঙ্গ-রচয়িতারা জন্মাতেন, তা হলে ... সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণের দরুণ বাংলাদেশে প্রথম শহিদ হতেন বনবিহারী মুখোপাধ্যায়'। বনবিহারীকে সেভাবে মারা হয়নি বটে কিন্তু ধীরে ধীরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বিস্মৃতির দিকে। বনফুল, পরিমল গোস্বামী, সজনীকান্ত দাস এবং মুজতবা আলির মতো দু-একজন ছাড়া কেউই তাঁর কথা কিছু লেখেননি।

পরিমল গোস্বামী 'স্মৃতিচিত্রণ'-এ লিখেছেন, 'ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছিলাম, তিনি ছিলেন দুর্দ্ধর্ষ ব্যক্তি। এমন চরিত্র সহজে দেখা যায় না। আজকের দিনের পাঠক তাঁকে চেনেন না, কিন্তু বাংলা ভাষায় তিনি ছিলেন স্যাটায়ারের রাজা। তাঁর নরকের কীট, দশচক্র প্রভৃতি রচনা আলোড়ন জাগিয়েছিল পাঠক-সমাজে। কার্টুন ছবি আঁকায় অসাধারণ পটু ছিলেন। তাঁর অনেক কার্টুন ছবি শনিবারের চিঠিতে বেরিয়েছে, পরে ভারতবর্ষেও দেখেছি। বিচিত্রায় তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা নামক তাঁর সচিত্র হারুর জীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা আজও তাঁর কবিতা রচনার ক্ষমতার কথাও মনে রেখেছেন নিশ্চয়।'

পরিমলবাবু জানলে হতাশ হতেন, তাঁর পরের প্রজন্ম বনবিহারীর নামই শোনেনি তো তাঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ হওয়া আমরা, যাঁরা বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে আশ্রয় করতে চাই, তাঁরাই বা কজনা জানি! এই না জানার পিছনে অনেকটা দায়ী স্বয়ং বনবিহারী।

কারণ নিজেকে এবং নিজের লেখা সম্পর্কে তাঁর কোনো মোহ ছিল না। তা ছাপানো বা রেখে দেওয়ার তাগিদ অনুভব করেননি। এই নিয়ে পরিমলবাবু বিস্তর আক্ষেপ করেছেন।

সৈয়দ মুজতবা আলী লিখছেন— 'বনবিহারীর অধিকাংশ লেখাই ছাপাখানা পর্যন্ত পৌঁছত না। প্রকাশিত হলে ফাইলে রাখতেন না। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধুকেও বলতেন না, 'অমুক কাগজে আমার লেখা বেরিয়েছে, পড়ে দেখো।'... বনবিহারী সম্বন্ধে প্রামাণিক কিছু লেখা প্রায় অসম্ভব। কারণ প্রায় অসম্ভব শুধুমাত্র তাঁর প্রকাশিত লেখা ও ব্যঙ্গচিত্র জোগাড় করা। বেনামে ছদ্মনামে তো লিখেছেনই, তদুপরি নিজের সৃষ্টির প্রতি তাঁর কোনো প্রকারের মোহ ছিল না বলে সেগুলোকে তাদের ন্যায্য সম্মান দেবার জন্য তিনি কোনো চেষ্টা তো করতেনই না, উল্টে নিতান্ত অজানা অচেনা কাগজে প্রায়ই বাছাই বাছাই লেখা ছাপিয়ে দিতেন। এবং আমার জানতে সত্যই ইচ্ছে করে, তিনি তাঁর লেখার জন্য কোনো দক্ষিণা পেয়েছেন কি না। আর এখনকার পাঠক জানবেনই বা কী করে! 'বেপরোয়া' পত্রিকা মাথা খুঁড়লেও মিলবে না। তাঁর লেখা সামাজিক নাটক 'একাল'; উপন্যাস 'যোগভ্রষ্ট', 'দশচক্র'; গল্প 'সিরাজির পেয়ালা'-র সন্ধান করতে গেলে রাখাল বাঁড়ুজ্যেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। বঙ্গবাণী, শনিবারের চিঠি, ভারতবর্ষে তাঁর প্রকাশিত লেখা ও ব্যঙ্গচিত্র খুঁজে পেতে দেখবে টিভি-তাড়িত বাঙালির সে সময় কোথা! আর অমন বদখত লোকের লেখা, ব্যঙ্গচিত্র পুনরুদ্ধার করে কেনই বা নিজেদের বিপদ ডেকে আনা! উৎস মানুষ পত্রিকার খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই বনবিহারী মুখোপাধ্যায়কে ঘুম থেকে জাগাতে চেষ্টা করছে। নিছক পূর্বজকে প্রণাম করার লোভে।

আমরা এমন অনেক বিপ্লবী, সমাজসংস্কারক, রাজনৈতিক নেতাকে দেখেছি, দেখছি বা তাঁদের কথা পড়েছি, যাঁদের কর্মজীবনের সঙ্গে বা মৌখিক ভাষণের সঙ্গে ব্যক্তি জীবনের অনেক সময়ই মিল থাকে না। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিষয়-আশয়ে মগ্ন হন, মস্ত দার্শনিক দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি হতে না পেরে ভেঙে পড়েন, অতি-বিপ্লবী বিপ্লব ছেড়ে আধ্যাত্মিক জগতে সেঁদিয়ে যান। এই ক্ষেত্রে ডাক্তার বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন মহান ব্যতিক্রম। অন্তত তাঁকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা তেমনটিই জানিয়েছেন।

এমন এক ব্যতিক্রমী মানুষকে নিয়ে লিখতে তাঁর জীবনের প্রথম পর্বটা জানতে পারলে ভাল হত। কোন তাড়নায়, কার প্রেরণায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছেলেটি অমন কালাপাহাড় হয়ে উঠল বোঝা যেত। কিন্তু সেই পর্বটা তেমন করে জানা যায় না। কম কথার মানুষ বনবিহারী লিখে বা কাউকে বলেও যান নি। খাপছাড়া ভাবে যেটুকু জানা গেছে, তা হল— বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৮৫ সালে। ওঁদের আদিনিবাস ছিল হুগলির গরলগাছায়। কর্মসূত্রে পরিবারের বাস ছিল কলকাতায়। বিপিনবিহারী ও অপর্ণা মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র ছিলেন বনবিহারী। বিখ্যাত শিল্পী বিনোদবিহারী ছিলেন তাঁরই অনুজ।

'বনবিহারী তাঁর বাল্যবয়সের অধিকাংশটা কাটান তাঁর মাতামহের সঙ্গে।... এই মাতামহটি ছিলেন গত শতাব্দীর ধনুর্ধর, অপরাজিত দার্শনিক এবং নৈয়ায়িক। যে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রাচ্য পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে ছিলেন সে যুগের চূড়ামণি, তিনি ছিলেন তাঁর নিত্যালাপী সখা। যে দ্বিজেন্দ্রনাথের গৃহে বঙ্কিমাদি মনীষীগণ আসতেন তত্ত্বালোচনার জন্য সেই দ্বিজেন্দ্রনাথ গিয়েছেন দিনের দিন এই নৈয়ায়িকের অপরিসর পথের ক্ষুদ্রতর গৃহে।' এই তথ্যটুকু জানতে পারি মুজতবা আলির সৌজন্যে। সংস্কৃত এবং ভারতীয় দর্শনে বনবিহারীর অগাধ পাণ্ডিত্যের উৎস যে এই মাতামহ-ই তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বনবিহারীর পাণ্ডিত্য নিয়ে আলোচনার আগে তাঁর মাতামহ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের দৈনন্দিন বাগযুদ্ধ ও তার যে পরিণতির কথা মুজতবা আলীর সরস কলমে বর্ণিত হয়েছে, তা পাঠককে জানাবার লোভ সম্বরণ করা যাচ্ছে না। মুজতবা লিখছেন—দ্বিজেন্দ্রনাথ ছিলেন এমনই আপন-ভোলা সাদা দিলের মানুষ যে তর্কে বিরক্তির সঞ্চার হলে তাঁর কণ্ঠ তপ্ততর ও উচ্চতর হতে আরম্ভ করত—বনবিহারীর মাতামহ এ তত্ত্ব জানতেন বলে সেটা আদৌ গায়ে না মেখে পূর্বের চেয়ে ক্ষীণতর কণ্ঠে মোক্ষমতর যুক্তি পেশ করতেন। খাওয়ার বেলা গড়িয়ে যায়—দ্বিজেন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে বেহুঁশ। শেষটায় বেলা প্রায় তিনটায় উত্তেজিত হয়ে আসন ত্যাগ করে বলতেন, 'ঝকমারী, ঝকমারী, এসব লোকের সঙ্গে তর্ক করা; আমি চললুম এবং এই আমার শেষ আসা।' বনবিহারীর মাতামহ ক্ষীণকণ্ঠে বলতেন, 'গিন্নী, পুঁইচচ্চড়ি রেঁধেছিল।' অট্টহাস্য করে দ্বিজেন্দ্রনাথ টেনে টেনে বলতেন, 'সেটা আগে বললেই হ'ত, আগে কইলেই হ'ত।' তারপর বারান্দায় প্রতীক্ষমাণ তাঁর 'গার্জেন'কে বলতেন (মহর্ষিদেব এই আপন-ভোলা যুবরাজের জন্য একটি তদারকদার নিযুক্ত করে রেখেছিলেন) 'যাও, বাড়ি থেকে দাঁত নিয়ে এসো গে।' শুধু খাবার সময়ই তিনি বাঁধানো দাঁত ব্যবহার করতেন। আমার ভাবতে বড় কৌতুক বোধ হয়, যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠতম দৌহিত্র বাড়ির কোর্মা-কালিয়া ছেড়ে অনাড়ম্বর নৈয়ায়িকের অপরিসর বারান্দায় পিঁড়িতে বসে পুঁইচচ্চড়ি চিবোতে চিবোতে উচ্চকণ্ঠে পাড়া সচকিত করে অকৃপণ প্রশস্তি গেয়ে চলেছেন।

পরদিন 'নাউ-চিংড়ি'! 'নাউ — লাউ না!'

ডাক্তারি পড়া বা বিলেত যাওয়া সত্ত্বেও বনবিহারীর মধ্যে যে সন্ন্যাসীসুলভ ঔদাসীন্য ছিল, তা যে এমন মানুষদের সান্নিধ্যলাভেরই ফল তা বুঝতে বেগ পেতে হয় না। (ক্রমশ)

ডাঃ সুজিতকুমার দাশ
(১৯৩৭-২০১১)

আশির দশক থেকেই কুসংস্কার বিরোধী ও যুক্তিবাদী মতামত প্রকাশের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়ায় উৎস মানুষ। বিভিন্ন পেশার মানুষ, বিশেষ করে ডাক্তারদের মধ্যে যাঁরা জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের যঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই পাশে এসে দাঁড়ালেন। ড্রাগ অ্যাকশন ফোরামের সংগঠক ডাঃ সুজিতকুমার দাশ তাঁর মৌলিক ও প্রতিবাদী লেখাগুলি দিতে থাকলেন। উৎস মানুষ পাশে পেয়ে গেল এক চিন্তাশীল দক্ষ লেখককে। এভাবেই তিনি উৎস মানুষের অনেকের কাছে হয়ে গেলেন 'সুজিতদা'। অপবিজ্ঞান, পরিবেশ, ডাঙ্কেল প্রস্তাব ও ওষুধনীতি, বেহালায় বিষাক্ত তেলে মৃত্যু, ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, তসলিমা নাসরিন—হরেক বিষয়ে তাঁর লেখাগুলি উঠে এসেছে উৎস মানুষের পাতায়। উৎস মানুষের আড্ডায় এসে মেতে উঠতেন সবার সঙ্গে; একবার তো সঞ্চালনাও করেছিলেন।

ড্রাগ অ্যাকশন ফোরাম ও উৎস মানুষের সম্পর্কের যোগসূত্র ছিলেন সুজিতদা। বইমেলায় উৎস মানুষের স্টলে 'নিষিদ্ধ ওষুধ', 'মানুষের জন্য ওষুধ না ওষুধের জন্য মানুষ'—ড্রাগের এসব চটি বইগুলোর চাহিদা ছিল বিপুল। ফোরামের সঙ্গে বই আদান প্রদান চলত বইমেলায়। উৎস মানুষের স্টলে খাবার দাবার এলে ড্রাগ অ্যাকশন ফোরামের বন্ধুদের তা দিয়ে আসার একটা রেওয়াজ ছিল। এই নিবিড় সম্পর্কের নেপথে ছিলেন সুজিতদা ও ডাঃ পীযুষকান্তি সরকারেরা। এরা দুটি সংগঠনকে নিজেদের বলেই ভাবতেন।

জনদরদী ও সমাজ-সচেতন ডাঃ সুজিতকুমার দাশের প্রয়াণ অনেকের মতো আমাদের কাছেও এক বিরাট ক্ষতি। ওঁর কলম চিরতরে থেমে গেল, ভাবতেই কেমন যেন লাগছে। সহজ গদ্যে আপাতকঠিন বিষয় নিয়ে লেখার মানুষ তো এমনিতেই কম। ওর মতো চিন্তাশীল মানুষের অনুপস্থিতিতে গণস্বাস্থ্য ও গণবিজ্ঞান আন্দোলন অভিভাবকহীন হয়ে গেল এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমরা মনে করি ডাঃ সুজিতকুমার দাশকে চট করে ভোলা যাবে না, কেননা পশ্চিমবাংলায় গণস্বাস্থ্য ও গণবিজ্ঞান আন্দোলনের ছিঁটেফোঁটা যেটুকু এখনো টিকে আছে, তা ওর মতো মানুষের আন্দোলনের পাশে পাশে থাকার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

উৎসমানুষ পরিচালকমণ্ডলী

বিজ্ঞানবোধ ও নৈতিকতা

সুজিতকুমার দাশ

১৯৯৪-এ উৎস মানুষের আড্ডায় সুজিতদা

আধুনিক বিজ্ঞানের---যাকে পশ্চিমা সাহেবি বিজ্ঞানও বলা চলে—উৎপন্ন অজস্র ফসল যেভাবে ভোগের ক্ষুধা মেটাচ্ছে এবং বাড়াচ্ছে, তাতে বিজ্ঞানকে মানুষ সমীহ করতে শিখবে, এটা স্বাভাবিক। এভাবে বিজ্ঞানের মর্যাদা ক্রমশ এমনভাবে বেড়েছে যে তা প্রায় পরশপাথরের কাছাকাছি উঠে গেছে। কোনো বস্তু, মতাদর্শ, প্রকল্প, প্রক্রিয়া, প্রভৃতি যা কিছু মানুষ যখন মর্যাদার আসনে তুলতে চায় তখন তাতে বিজ্ঞানের ছোঁয়া লাগাবার চেষ্টা করে; যদি কোনোমতে এটা গেলানো যায় যে, বস্তুটির বা বিষয়টির মধ্যে একটু 'বিজ্ঞান' আছে তাহলেই হলো, তাহলেই জাতে উঠে গেল। একটু 'বিজ্ঞান' থাকলেই সেটা আর ফেলনা নয়, তাকে তখন সবাই সমীহ করে। তাই অবিরত বলা হয়—জ্যোতিষশাস্ত্র বৈজ্ঞানিক, হোমিওপ্যাথি বৈজ্ঞানিক ইত্যাদি। বেদ, রামায়ণ, মহাভারতের মধ্যেও বিজ্ঞান আবিষ্কার করা হয়েছে; নানা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা হয়েছে আমাদের প্রাচীন কুসংস্কার, আচার-বিচারের মধ্যে প্রচুর বিজ্ঞান রয়েছে; দেখানো হয়েছে জাতপাতের বিভেদ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম প্রথা আসলে দারুণ এক বৈজ্ঞানিক প্রথা। শুধু এসব ব্যাপারেই নয়, বিজ্ঞান সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে। এখন সামাজিক প্রগতির ভিত্তি বৈশিষ্ট্য ও মার্কা হলো বিজ্ঞানের প্রগতি। উন্নত দেশ কথাটার মানে হলো বিজ্ঞানে উন্নত। পশ্চাৎপদ মানে বিজ্ঞানে পশ্চাৎপদ। আমরা সাহেবদের দরজায় ভিক্ষাপাত্র নিয়ে নির্লজ্জের মতো দাঁড়িয়ে থাকি উন্নত বিজ্ঞান-প্রযুক্তি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায়; তা না পেলে আমাদের উন্নতি হবে না। সোভিয়েতের পতনের একটি প্রধান কারণ হিসেবে বলা হয়েছে—বিজ্ঞানের প্রতিযোগিতায় সমাজতন্ত্র ধনতন্ত্র থেকে পিছিয়ে

পড়ল, তাই টিকতে পারল না। বিজ্ঞান ছাড়া এখন খেলাধুলো গানবাজনা অচল। ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমেরিকা দেখিয়ে দিয়েছে যে পদাতিকের প্রয়োজন ফুরোচ্ছে, এখন থেকে বিজ্ঞান দিয়েই যুদ্ধে জেতা যাবে।

বিজ্ঞানের এহেন আধিপত্য সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে যে, অবিজ্ঞানের রাজত্বের পরিধি আরো বিস্তৃত। অধিকাংশ মানুষ ধর্ম কুসংস্কার প্রভৃতি অবিজ্ঞানজনিত বিশ্বাসবোধ মনের মধ্যে রেখে দিয়েছে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের কাজকর্মে তা মেনে চলে, বিজ্ঞানের অবদান রেডিও, টিভি, সংবাদপত্রের মাধ্যমেই নানা অবিজ্ঞানের প্রচার চালানো হয়। বিজ্ঞানের প্রগতির পক্ষে সবচেয়ে আতংকজনক সমস্যা হলো---এদেশে খোদ বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানকর্মীরাই অবিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাসে ভরপুর। অর্থাৎ বিজ্ঞানমনস্কতা বেশিদূর এগুতে পারে নি। বিজ্ঞানীরাই যদি বিজ্ঞানমনস্ক না হতে পারে অন্যরা তাহলে কীভাবে হবে? আংটি, মাদুলি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বিজ্ঞানীদের দুর্বলতার কাহিনী প্রগতিশীল মহলে কৌতুক, বিদ্রূপ বা হতাশার খোরাক জোগায়। সম্প্রতি সমস্যাটা আরো বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। একটি দৈনিকপত্রের প্রতিবেদনে কিছু বাঘা বাঘা বিজ্ঞানী খোলাখুলি ভূত ও ভগবানে বিশ্বাসের কথা অসংকোচে স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে ধর্মীয় ও কুসংস্কারজনিত আচার পালনে তাদের সমর্থন আছে। 'বাঘা বাঘা' কথাটার অর্থ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। কিছুদিন আগে 'উৎস মানুষ'-এ প্রকাশিত এক পত্রে জানানো হয়েছে যে, এক নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানকর্মী ও বিজ্ঞানী প্রকাশ্য সভায় 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' প্রসঙ্গে বক্তৃতায় ঘোষণা করেছেন—ধর্ম ও ঈশ্বরকে বাতিল করে বিজ্ঞানের জয়-ধ্বজা ওড়ানো চলে না। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের নানা বিবরণে এ খবরও ছড়িয়েছে যে, আন্দোলনের কোনো কোনো নেতৃস্থানীয় কর্মী আংটি পরা হাত নেড়ে বিজ্ঞানমনস্কতাকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান। এই ঘটনাগুলি স্বভাবতই বিভ্রান্তি ও হতাশা সৃষ্টি করে। অনেকে এই বিজ্ঞানীদের নিন্দা করেছেন। এর কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে কেউ বলেন যে সমাজে শ্রেণী-আধিপত্য ও পুরুষ-আধিপত্য থাকলে এমনটা হয়। বিজ্ঞানীরা শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর অংশীদার, শোষণের ফসল ভোগ করেন এবং তাই তারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য সজ্ঞানে সচেষ্ট থাকেন। কেউ বলেন যে জীবনের অনিশ্চয়তা ও জীবন ধারণের নানা প্রতিকূলতা অন্যান্যদের মতো বিজ্ঞানীদেরও মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয় এবং তারই ফলশ্রুতি হলো ভূত-ভগবান-কুসংস্কার-এ বিশ্বাস। এইসব সূত্রগুলি কিন্তু কারণ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়। শোষণের অংশীদার হলেই বা, তার সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতার সম্পর্ক কী? বিজ্ঞানমনস্ক হলেও তো শোষণের অংশীদার হতে পারে। প্রতিকূলতা মানুষের চিরসঙ্গী। প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করেই তো মানুষ বিজ্ঞানচর্চা করেছে, বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তুলেছে। প্রতিকূলতা তো ক্রমশ পিছু হটছে এবং তার ফলে বিজ্ঞানমনস্কতা ক্রমশ আরো শক্তিশালী হওয়ার কথা। কিন্তু তার উল্টোটাই হচ্ছে। কেউ কেউ এমনও বলেন যে, বিজ্ঞানমনস্কতা একটি আদর্শ জীবনদর্শন। একথাটা একটু আতিশয্য বলে মনে হয়। বরং ধর্মকে একটি নিটোল জীবনদর্শন বলা যায়। কারণ ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনের সবরকম সমস্যা ও প্রশ্নের এক ধরনের মীমাংসা ধর্মের মধ্যে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন—ধর্ম না-কি একসময়ে একটি আদর্শ জীবনদর্শন ছিল। ঠিক জানি না, হয়তো ছিল, যদিও যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগ করে এই মতের সমর্থন মেলে না। কিন্তু ধর্ম অবশ্যই এক ধরনের জীবনদর্শন, কারণ তার মধ্যে নৈতিকতা আছে। ধর্মের নৈতিকতা বর্তমান যুগে অবাঞ্ছিত, বহুক্ষেত্রে নিন্দনীয়ও বলা চলে, কিন্তু সেটা এক পুরোনো যুগের নৈতিকতা। নৈতিকতা না থাকলে তা জীবনদর্শন হতে পারে না। বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে নৈতিকতার কী-রকম সম্পর্ক তা আলোচনাসাপেক্ষ।

বিজ্ঞান, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবাদ—এসব নিয়ে আমরা এত হৈ-হৈ করি কেন? সবাই যদি বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে যায়, তাহলেই সবাই খেতে পরতে পাবে, সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করবে, তা তো নয়। সর্বজনীন বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জন করলেই বৈষম্য, শোষণ, অনাচার, অত্যাচার, দুঃখকষ্ট নির্মূল হয়ে যাবে, তাও নয়। যা হবে, সে বিষয়ে মোটামুটি এক ধরনের স্বচ্ছ ধারণা করে নিলে গাত্রদাহ বা মনোকষ্ট কমবে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তাৎপর্য, অবদান ও পরিধি একটু বুঝে নেওয়ার দরকার আছে।

অবিজ্ঞান-প্রসূত ধারণা ও বিশ্বাসবোধ যে-সব বৈষম্য ও অনাচারের সৃষ্টি করেছে সেগুলি দূর হবে বিজ্ঞানমনস্কতা বাড়লে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো ধর্ম ও কুসংস্কার। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, জাতপাতের বৈষম্য, নারী অবদমন প্রভৃতি তো আছেই, অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাসবোধের ফলে মানুষ, বিশেষত দরিদ্র মানুষ অজস্র ধরনের আর্থিক শোষণ ও অপচয়ের শিকার হয়, যথা—আংটি, মাদুলি, গুরুবাবা, মানত, পুজো, ওঝা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু অবিজ্ঞানের আরো গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবটা সুদূরপ্রসারী। অবিজ্ঞানজনিত বিশ্বাসবোধ মানুষকে মানসিক ও আত্মিক জগতে পঙ্গু করে ফেলে, যার ফলে পুরো মানুষ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়, মানুষের অন্তর্নিহিত সম্ভাব্য চরিত্রগুণ, মেধা, প্রতিভা বিকশিত হওয়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে। যেমন ধরুন—বর্ণ ভেদপ্রথার অনুশাসনে নিচু জাতের পক্ষে কায়িক শ্রম ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না কিন্তু পরে ঐ প্রথা শিথিল হওয়ার ফলে দেখা গেল মেধা, প্রতিভা, কুশলতা তাদের মধ্যেও আছে এবং সেগুলি বিকশিত হয়ে সামাজিক উন্নতির সহায় হয়েছে। নারীর ক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা গেছে। বিজ্ঞানমনস্কতার তাৎপর্য এইখানে বেশ স্পষ্ট। যারা বিজ্ঞানচর্চা করেন তাদের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারিত না হলে সৃজনশীলতা বিকশিত হতে

পারে না, বাধা পায়। লক্ষ্য করে দেখবেন—ভারতীয় বিজ্ঞানীমহলে সৃজনশীলতার অবদান খুব কম। বিজ্ঞানের কুশলী কারিগর অনেক পাওয়া যাবে কিন্তু সৃজনশীল বিজ্ঞানী খুঁজতে গেলে মাইক্রোস্কোপ লাগবে। কেউ যদি বলেন—মোটেই নয়, সৃজনশীলতার অভাবের কারণ হলো বিজ্ঞানচর্চার আধুনিকতম পরিকাঠামোর অভাব, তাহলে সেটা একটু অজুহাতের মতো সোনাবে। কারণ, আমাদের সমাজের প্রয়োজনে বিজ্ঞানচর্চার অসংখ্য ক্ষেত্র আছে যাতে আধুনিকতম সূক্ষ্ম জিনিসপত্র লাগে না। তাছাড়া এটাও বলা যায় যে, আধুনিকতম পরিকাঠামো আকাশ থেকে পড়ে না, তা গড়তে গেলেও লাগে সৃজনশীলতা।

শুধু এটা নয়, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছাড়া অন্যক্ষেত্রেও সৃজনশীলতা বিজ্ঞানমনস্কতা ছাড়া বিকশিত হওয়া শক্ত। বিজ্ঞানমনস্কতার মূল কথা হলো প্রশ্ন, অনুসন্ধান, বস্তুনিষ্ঠা ও যুক্তিবিচার। তাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ছাড়াও অন্যক্ষেত্রে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রয়োজন, গুরুত্ব ও ভূমিকা রয়েছে। তাই নানা সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি, কারণ ও সমাধান অনুসন্ধানে বিজ্ঞানমনস্কতা ছাড়া সঠিক উপলব্ধি অর্জন করা যায় না এবং তা না হলে সামাজিক প্রগতির উদ্দেশ্যে সৃজনশীল অবদানের জন্ম হয় না। অর্থাৎ বিজ্ঞানমনস্কতার দরকার শুধু বিজ্ঞানীদের জন্য নয়, দরকার সমাজের সব মানুষের জন্য।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে—বিজ্ঞান কী? বর্তমান আলোচনার প্রয়োজনে এক কথায় বলা যায়—বিজ্ঞানের পরিচয় হলো নিয়মের রাজত্ব। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হলো নিয়মের রাজত্ব, অসংখ্য নিয়মের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় চলছে, ঈশ্বরের লীলার কোনো ভূমিকা নেই। বিজ্ঞান এই নিয়মের রাজত্বকে একটু একটু করে উন্মুক্ত করছে, নিয়মকে জেনে বুঝে কাজে লাগিয়ে বাঁচার, ভোগের ও উন্নয়নের রসদ আহরণ করছে। মানব সমাজের গঠন, ক্রিয়াপ্রক্রিয়া, গতি-প্রগতির মধ্যেও নিয়ম খোঁজা হয়েছে এবং পাওয়া গেছে। প্রাকৃতিক নিয়মের বন্ধন যত দৃঢ়, মানবসমাজের নিয়ম তত নয়; প্রাকৃতিক নিয়ম যত স্পষ্ট করে জানা গেছে, মানবসমাজের ক্ষেত্রে ততটা নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হলো—প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তথ্য, তত্ত্ব ও হাতিয়ার প্রয়োগ করে সমাজবিজ্ঞান অনেকদূর এগিয়েছে। আবার এই দুই-এর মধ্যে পার্থক্যও বেশ মৌলিক। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম যে-রকম অমোঘ, সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে-রকম নয়, কারণ সমাজবিজ্ঞানের নিয়ম বহুলাংশে নির্ভরশীল মানুষের স্বেচ্ছাক্রিয়ার ওপর।

এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের মীমাংসার দরকার আছে, বিশেষত বিজ্ঞানমনস্ক ও গণবিজ্ঞান আন্দোলনের লোকজনের। শুধু বিজ্ঞানমনস্ক হলেই কি সামাজিক প্রগতি এগুবে? বিজ্ঞানমনস্কতা আমাদের হাতে যে সব হাতিয়ার এনে দেয় তা দিয়েই কি বৈষম্যহীন মুক্ত স্বাধীন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব? আরো স্পষ্ট করে বলি। যদি বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারিত হওয়ার ফলে ধর্ম ও সংস্কারজনিত বিশ্বাসবোধ দূরীভূত হয়, ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব কমে যায়, তাহলেই কি জাতপাতের বৈষম্য ও নারী অবদমন থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে? মানুষের সমানাধিকার অর্জনের পথে সব বাধা অপসারিত হবে? সন্দেহ আছে। বিজ্ঞান আমাদের কাছে যে তথ্য হাজির করেছে তাতে জানা যায় ও বোঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের চেয়ে, পুরুষ নারীর চেয়ে, সাহেব নিগ্রোর চেয়ে, খ্রীষ্টান ইহুদীর চেয়ে উত্তম নয়। কিন্তু এ কথা জানায় নি যে, সব মানুষ সমান। বরং আপাতত এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য যে মানুষের মধ্যে ভিন্নতা আছে, পার্থক্য আছে, শারীরিক মানসিক জৈবিক রকমফের আছে, শক্তি বুদ্ধি মেধার প্রভেদ আছে, দেবত্বও আছে পশুত্বও আছে অথবা বলা যায়, বিজ্ঞানমনস্কতাও আছে কুসংস্কারও আছে। তাহলে মানুষের সমানাধিকার চাইছি কিসের ভিত্তিতে, কোন্ যুক্তিতে? চাইছি মানবিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে, নৈতিকতার যুক্তিতে। মানবিক মূল্যবোধ বা নৈতিকতার সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ কী? আপাতত তেমন কোনো কার্যকারণ সম্বন্ধ দেখা যায় না।

তাহলে আরো কথা আছে। গণতান্ত্রিক অধিকার, মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার—এগুলি কি বৈজ্ঞানিক? এইসব মূল্যবোধগুলি কি বিজ্ঞানমনস্কতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে কিংবা বিজ্ঞামনস্কতা দিয়ে কি এইসব অধিকার অর্জন করতে পারব? বিজ্ঞামনস্কতার ফলে সেকুলারিজম-এর প্রভাব বাড়ে এবং আমরা সেকুলার সমাজ ব্যবস্থা চাই। কিন্তু সেকুলার সমাজে কি মালিক শ্রমিককে শোষণ করা বন্ধ করে দেবে? মালিক কর্তৃক শ্রমিকের শোষণ কি অবৈজ্ঞানিক? কমিউনিস্টরা বলবে—হ্যাঁ, মার্কসবাদ হলো বৈজ্ঞানিক মতবাদ, মার্কসবাদ শ্রমজীবী মানুষের শোষণের বিরোধী, সব রকম শোষণ থেকে মুক্তির মতাদর্শ, এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ প্রয়োগের ফলেই এটা জানা সম্ভব হয়েছে। এই যুক্তিটা কিন্তু বেশ নড়বড়ে, তেমন টেকসই নয়। মার্কসবাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বটে কিন্তু মতাদর্শের পিছনে বৈজ্ঞানিক তথ্য বা নিয়মের তেমন কোনো হদিশ পাওয়া যায় না। শ্রমজীবীরাই সব সম্পদ উৎপাদন করে, তাই সেই সম্পদের মালিকানা তাদের হাতেই থাকা উচিত—এর মধ্যে বিজ্ঞান কোথায়? সমাজের সংখ্যাগুরু শ্রমজীবী মানুষ শাসক হবে, রাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ করবে, উৎপাদন উপকরণকে নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদন ক্রিয়া পরিচালনা করবে, সমবন্টন করবে, শ্রমজীবী রাজার রাজত্বে সবাই রাজা হবে—এসবের মধ্যে বিজ্ঞানের অবদান কতটা? সবাইকে কাজ করে খেতে হবে, অপরের শ্রমের ফল আত্মসাৎ করে কারো ফুর্তি করার অধিকার থাকবে না, প্রত্যেকের কাছ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রমশক্তি নেওয়া হবে এবং সেই শ্রমের পরিমাণ

অনুযায়ী সম্পদ বন্টন হবে, পরে চূড়ান্ত উন্নত স্তরে প্রত্যেকে সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রম দেবে কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ নেবে—এসব কি বিজ্ঞানের কথা? এসব কথা হলো নৈতিকতার কথা, মানবিকতার কথা, মানুষ হিসেবে এক বিশেষ মর্যাদাবোধের কথা, মানুষের সঙ্গে মানুষের মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্কের মূল্যবোধের কথা। মার্কসবাদ বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছে, বৈজ্ঞানিক তথ্য, সূত্র ও বিশ্লেষণ কাজে লাগিয়েছে বটে কিন্তু মার্কসবাদের মতাদর্শের ভিত্তি হলো নৈতিকতা মানবতা।

যেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি তা হলো—কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞান নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলায় সাহায্য করে, নৈতিক ভিত্তিতে সমাজ গঠনের হাতিয়ার জোগায়, আবার অন্য কিছু ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও নৈতিকতার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, আছে পরস্পর বিরোধিতা। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের মূল শ্লোগানটা নিয়েই দ্বন্দ্বটা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। বলা হয়—বিজ্ঞানকে জনগণের মঙ্গলের কাজে লাগাতে হবে, জনস্বার্থরক্ষার হাতিয়ার করতে হবে। এই শ্লোগানের মধ্যে বিজ্ঞান কোথায়, বিজ্ঞানমনস্কতার অবদানই বা কতটুকু? এমন কোনো বৈজ্ঞানিক সূত্র বা থিয়োরি এখনো জানা যায় নি যার দ্বারা প্রমাণ হয় যে, জনসাধারণের মঙ্গলের কাজটা বিজ্ঞানসম্মত। বরং বিজ্ঞানচর্চার যেসব অবদান বা ফসল মানুষ অর্জন করেছে তা বরাবরই মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থরক্ষার কাজে লাগিয়েছে এবং সেই প্রক্রিয়ায় যদি অন্য লোকেরাও উপকৃত হয়ে থাকে তবে তা এসেছে উপরি পাওনা হিসেবে। আর বিজ্ঞানের অবদানকে মানুষের ক্ষতি করার কাজে লাগানোর নজির তো ভূরিভূরি। এই যে কিছু লোক বিজ্ঞানচর্চাকে, বিজ্ঞানের অবদানকে কুক্ষিগত করে রেখে সংকীর্ণ স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে—এ কাজটা কি অবৈজ্ঞানিক না অবিজ্ঞানপ্রসূত? না-কি এইসব প্রক্রিয়ার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক নিয়মবিধির কোনো সম্পর্ক নেই? বিজ্ঞানকে যদি সমগ্র মানবসমাজের কাজে না লাগিয়ে একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠীর স্বার্থে কাজে লাগানো হয় তাতে, মনে হয়, বিজ্ঞানের কিছু যায় আসে না বা বৈজ্ঞানিক নিয়মবিধির কিছু হেরফের হয় না। এটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায় যে, বৈষম্যমূলক আচরণ সত্ত্বেও বিজ্ঞানের অগ্রগতি কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি। সমাজবিজ্ঞান বোঝাতে পারে কীরকম ঐতিহাসিক বিবর্তনে, সামাজিক শক্তিগুলির কী ধরনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এসে এক সংকীর্ণ গোষ্ঠী, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে, বিজ্ঞানচর্চাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, এবং তারাই ঠিক করে দেয় কীভাবে মানুষ বিজ্ঞানের ফসল ভোগ করবে, কারা কতটুকু করবে এবং কারা করবে না। তাই দেখা যায়, একদিকে বিজ্ঞানের ফসল নিয়ে অপচয় করা হচ্ছে, অন্যদিকে তার অভাবে মানুষ অকালে মারা যাচ্ছে। এই যে অবস্থা, এর সঙ্গে বিজ্ঞানের কি কোনো বিরোধ আছে? চোখে তো পড়ে না। কিন্তু এই অবস্থাটা কি অসঙ্গত, অন্যায়, অসহ্য নয়? এই প্রশ্নটাই, বোধহয়, বিজ্ঞানের আওতার মধ্যে পড়ে না। এই প্রশ্নটা নৈতিক মূল্যবোধের। যে ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠী জনগণকে বঞ্চিত করে বিজ্ঞানকে কুক্ষিগত করে রেখেছে তারা মুখে যাই বলুক, এটা বিশ্বাসই করে না যে, সব মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার আছে; তারা মনে করে এই বিশ্ব এই সমাজ উত্তমের জন্য, অধমরা নিপাত যাক (সামাজিক ডারউইনবাদ)। এটা এখন ধরা পড়ে গেছে যে, বিশ্বসমাজের এক স্বনির্বাচিত উত্তম মানবগোষ্ঠী, আমেরিকার নেতৃত্বে, সত্যি সত্যিই মনে করে যে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নতি এমন স্তরে পৌঁছেছে যে, এখন আর অধমদের দরকার নেই, অধমদের এই পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করে দেওয়া যায় এবং পৃথিবীকে মনের মতো করে গড়ে তুলতে গেলে তা করাই সঙ্গত; এই ভবিষ্যত কর্তব্যের পরিকল্পনা ও কর্মসূচীও তৈরি করার উদ্যোগ চলছে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে এই দৃষ্টিভঙ্গীর কি বিরোধ আছে? বিজ্ঞানমনস্কতা দিয়ে এই কাজের নিন্দা করা, একে অন্যায় বলে প্রতিপন্ন করা কি সম্ভব? এটা স্পষ্টভাবেই নৈতিক মূল্যবোধের প্রশ্ন। বিজিত মানুষকে মেরে ফেলা, তাকে দাস করে রাখা, ক্রীতদাসের ব্যবসা করা, বর্ণপ্রথা সৃষ্টি করে ছোটোজাতের ওপর অত্যাচার ও শোষণ, নারীকে দাসে পরিণত করা, সামাজিক ক্ষমতাহীন শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করা প্রভৃতি এইসব মূল্যবোধের স্তর পার হয়ে, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় বর্তমান মূল্যবোধ জন্ম নিয়েছে—মানুষের সমানাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ইত্যাদি। এই জন্মপ্রক্রিয়ায় প্রধান সাহায্য এসেছে অবশ্যই বিজ্ঞানের কাছ থেকে, প্রাকৃতিক ও সমাজবিজ্ঞান উভয়েই মূল্যবোধ পরিবর্তনে প্রধান শক্তি। কিন্তু বিজ্ঞানের ভূমিকা বা এক্তিয়ার, মনে হয়, ঐ পর্যন্ত।

কমিউনিস্টরা বলবে—তা কেন হবে। শ্রেণীবিভক্ত, বৈষম্য জর্জরিত সমাজ থেকে সমানাধিকারপূর্ণ গণতান্ত্রিক মুক্ত সমাজে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি বৈজ্ঞানিক; বিজ্ঞানের নিয়মেই এটা ঘটবে। মার্কসবাদে দেখানো হয়েছে যে, বৈষম্যকারী মূল্যবোধের ভিত্তি হলো বৈষম্যকারী অর্থনীতি। অর্থনীতির নিজস্ব অমোঘ বৈজ্ঞানিক নিয়মেই বৈষম্যকারী পুঁজিবাদী অর্থনীতি শেষ পর্যন্ত টিকতে পারবে না। সম্পদের মালিক পুঁজিপতি ও সম্পদ সৃষ্টিকারী শ্রমিকের মধ্যে যে শোষক-শোষিতের সম্পর্ক, সেটা কিছুদিন পরেই অবশেষে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের পথে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে এবং ফলে, দ্বন্দ্ব উপস্থিত হবে, সামাজিক বিপ্লব ঘটবে, শোষক-শোষিত বা মালিক-শ্রমিক উৎপাদন সম্পর্ক ভেঙে পড়বে, গড়ে উঠবে নতুন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক যেখানে শ্রমিক নিজেই মালিক, এবং এই সম্পর্কের সহায়তায় উৎপাদিকা শক্তি পূর্ণ বিকশিত হবে, সম্পদের সমবন্টন হবে এবং তার ভিত্তিতে সমানাধিকার, গণতান্ত্রিক অধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই হলো ফরমুলা।

মার্কসবাদ থেকে তার অন্তর্নিহিত মর্মবস্তুটুকু বাদ দিলে এরকম ফরমুলা তৈরি করা যায়, অনেকে তা করেছেও।

রাজনৈতিক-অর্থনীতির যে ক্রিয়াপ্রক্রিয়াগুলি মার্কসবাদী বিশ্লেষণে উন্মুক্ত করা হয়েছে সেগুলিকেই এই ফরমুলায় সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি হিসেবে হাজির করা হয়েছে; মনে করা হয়েছে, উৎপাদন সম্পর্ক ও উৎপাদিকা শক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ হলো বৈজ্ঞানিক নিয়মের মতোই অমোঘ এবং পরিবর্তিত নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক সেই নিয়মের মতোই অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটে নি, ঘটার কথাও নয়। মার্কসবাদের মর্মবস্তু হলো মানুষ। মানুষ নিজের প্রয়োজনে, শক্তিতে, বুদ্ধিতে বেঁচে থাকার উন্নতি বিধানের রসদ জোগাড় করে। প্রকৃতিকে জেনে, প্রাকৃতিক নিয়মবিধি বুঝে, তাকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদ বৃদ্ধি ও সম্পদ বৃদ্ধি করে। কিন্তু সেই সম্পদ বন্টন করে নিজের মূল্যবোধ অনুযায়ী, কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী নয়। সামাজিক সম্পর্কগুলি (বড়-ছোটো, জমিদার-প্রজা, উঁচুজাত-নিচুজাত, মালিক-শ্রমিক, পুরুষ-নারী ইত্যাদি) মানুষ নিজেই গড়ে তোলে নিজের মূল্যবোধ অনুযায়ী, কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়মের অমোঘ বিধান অনুযায়ী নয়। অবশ্যই এইসব সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রক্রিয়ায় মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মবিধিগুলি লঙ্ঘন করতে পারে না এবং সামাজিক নিয়মবিধির টানাপোড়েনকে উপেক্ষা করতে পারে না। কিন্তু মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মবিধির দাসত্ব করে না, বরং প্রকৃতির নিয়মবিধিগুলি বুঝে নিয়ে নানাভাবে তার ওপর নিজের ইচ্ছা প্রয়োগ করে। প্রকৃতির সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে (অর্থাৎ উৎপাদন কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে) যে সামাজিক সম্পর্কগুলি গড়ে উঠেছে তা মানুষের নিজের তৈরি, তার নিয়মবিধি গড়ে উঠেছে মানুষের স্বেচ্ছাক্রিয়ার ফলে, কোনো পূর্ব নির্ধারিত অমোঘ ঠিকুজি-কুষ্ঠির প্রভাবে নয়। সমানাধিকার পূর্ণ বৈষম্যহীন মুক্ত সমাজ কোনো অমোঘ সামাজিক-অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতায় গড়ে ওঠার কথা নয়, গড়া যাবে মানুষের স্বেচ্ছাক্রিয়ার শক্তিতে যখন সংখ্যাগুরু বঞ্চিত শ্রমজীবী মানুষ তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার মতো চেতনার স্তরে পৌঁছাবে; অধিকারবোধ ও মূল্যবোধ অর্জন করবে। এটাই মার্কসবাদের কথা। অর্থাৎ চালিকাশক্তি মানুষ নিজেই, প্রেরণা হলো নৈতিক মূল্যবোধের; বৈজ্ঞানিক নিয়মের নয়। যে সমাজে সম্পদ সৃষ্টিকারী শ্রমজীবী মানুষকে বঞ্চনা করা হচ্ছে, নিচুজাতের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, নারীকে পদদলিত করা হচ্ছে, সেখানে কোনো বৈজ্ঞানিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হচ্ছে না, হচ্ছে নৈতিকতার বিসর্জন।

বিজ্ঞানের নিজস্ব একটা বিষয় ধরুন। চিকিৎসাবিজ্ঞানচর্চার জন্য ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হয়। যদি বিজ্ঞানের নিজস্ব গণ্ডির নিয়মবিধির কথা বিবেচনা করেন তাহলে অনেক পরীক্ষার (এক্সপিরিমেন্ট) পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত মডেল হলো জীবন্ত মনুষ্যদেহ। কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবন্ত মানুষের ওপর পরীক্ষা না করে করা হয় নানা রকমের জীবন্ত পশুদেহের ওপর। জীবন্ত মানুষের ওপর পরীক্ষা করলে বিজ্ঞানের বা বিজ্ঞামনস্কতার কিছু ক্ষতি হয় না, বরং প্রভূত লাভ হয় কিন্তু নৈতিকতা আঘাত পায়। এখানে নৈতিকতার কাছে বিজ্ঞান হার মেনেছে। জীবন্ত মানবদেহের ওপর পরীক্ষা কখনো হয় নি তা নয়। উচ্চস্তরের সভ্য জার্মান সাহেবরা করেছিল। জাপানের ওপর উচ্চতর স্তরের সভ্য মার্কিনরা যে আণবিক বোমা ফেলেছিল, এখন জানা গেছে যে যুদ্ধজয়ের জন্য তার দরকার ছিল না, দরকার ছিল মানবদেহের ওপর আণবিক বোমার ফলাফল পরীক্ষার জন্য। তার মানে এই নয় যে, বিজ্ঞানীরাই ফলাফল দেখার উদ্দেশ্যে বোমাগুলি ফেলেছিল। বোমা ফেলার সিদ্ধান্ত রাজনীতিকদের, তারা সে কাজটা করেছে তাদের নৈতিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে, সেখানে বিজ্ঞানমনস্কতার কোনো ভূমিকা ছিল না। নানাদেশে বর্তমানে এরকম নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠেছে যে, পশুরও প্রাণ আছে, অনুভূতি যন্ত্রণাবোধ আছে, তাই জীবন্ত পশুর ওপর পরীক্ষা নিষিদ্ধ হোক; এই দাবিটা এখনো তেমন জোরদার হয় নি কিন্তু মানবসমাজ ক্রমশ এই দাবি মেনে নেবে না, এমন কথা বলা যায় না। নিলে, সেটা নৈতিকতার জয় হবে, বিজ্ঞানের নয়।

এবারে পুরোনো কথায় ফেরা যেতে পারে। আমাদের বিজ্ঞানীরা কেন বিজ্ঞানমনস্ক নয়? বিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানমনস্ক না হলে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার আটকে যাবে, দেশের প্রগতি ব্যাহত হবে; সমস্যাটা কি সত্যিই এইরকম? যে বিজ্ঞানীরা অবিজ্ঞানে আচ্ছন্ন তাদের সম্বন্ধে আর একটু না জানলে চট করে কার্যকারণ সম্পর্ক বোঝা শক্ত। খোঁজ নিয়ে দেখুন, উচ্চপদে অধিষ্ঠিত বিজ্ঞানী কী প্রক্রিয়ায় উচ্চপদটি বাগালেন। বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা যেসব গবেষণা করেন তা কি কারো কাজে লাগে? একটা কেচ্ছার কথা বলি। এদেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক সর্বভারতীয় জার্নালে প্রকাশিত বাঘা বাঘা চিকিৎসক-গবেষকদের নিবন্ধ বিশ্লেষণ করে এক মাভেরিক ডাক্তার দেখিয়েছিলেন যে, প্রধান প্রামাণ্য অংশগুলি না বলিয়া অপরের রচনা থেকে টোকা এবং এটা প্রকাশ করেছিলেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সর্বভারতীয় সম্মেলনে। প্রতিক্রিয়া কি হলো শুনবেন? সকলেই মিনিটখানেক নীরব ছিলেন এবং তারপর চেয়ারম্যান অ্যাজেন্ডার পরের আইটেম নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে দিলেন। না, কেউ লজ্জা পায় নি। ওয়াকিবহাল লোকজন বিজ্ঞানীমহলের এরকম অনেক খবর রাখেন। গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কী ধরনের গবেষণা হয়, উদ্যোগী গবেষকদের কীরকম উৎসাহ দেওয়া হয়, প্রতিভাসম্পন্ন গবেষকদের কীরকম পুরস্কৃত করা হয়, নিয়োগ ও প্রমোশনের ক্ষেত্রে কীরকম পক্ষপাতশূন্য নীতি প্রয়োগ করা হয়—এসব নিয়ে একটি সরকারি তদন্ত হয়েছিল সেই নেহরুর আমলে এবং রিপোর্টটি প্রকাশিত হওয়ার পর চারিদিকে টি টি পড়েছিল। এর পরেও অবস্থার উন্নতি হয় নি, সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। কথাটা হলো—এইসব বিজ্ঞানীরা কি বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারেন? এবং হলেও কি কিছু যায় আসে? প্রশ্নটা অন্যদিক থেকেও বিবেচনা করা যায়। যে বাঘা বিজ্ঞানীটি ভূতের সঙ্গে গল্প

করেন তার নিন্দা করার দরকার আছে ঠিকই কিন্তু যে বিজ্ঞানীটি চোর, তার বেলা? এবং যদি এই চোর বিজ্ঞানীটি দারুণ বিজ্ঞানমনস্ক হন, বিজ্ঞানমনস্কতা নিয়ে 'যোজনা' পত্রিকায় অথবা 'উৎস মানুষ'-এ জমাটি প্রবন্ধ লেখেন, গণবিজ্ঞান আন্দোলনে পৃষ্ঠপোষক হন—তাহলে? একজন বিজ্ঞানী ছোটোলোকদের ঘৃণা করেন এবং মনে করেন, পাতিব্রত্যই নারীর মুখ্য জীবনাদর্শ কিন্তু আর এক বিজ্ঞানী ছোটোলোকদের ভালোবাসেন এবং নারীকে মানুষের মর্যাদা দেন। এই দুজনের সামাজিক গুরুত্ব বিচার করা হবে কি বিজ্ঞানমনস্কতা দিয়ে? নাকি নৈতিকতা দিয়ে?

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো বিজ্ঞানীর মূল্যায়ন হওয়া উচিত এই নিরিখে যে, বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি একনম্বরী কি না। একনম্বরী না হলে তার পক্ষে বিজ্ঞানমনস্ক হওয়া শক্ত। তারপর সামাজিক ক্ষেত্রে বিচার করতে গেলেই নৈতিকতার প্রশ্নটি এসে যায়, এড়ানো যায় না। পশ্চাৎপদ বৈষম্যকারী নৈতিক মূল্যবোধে হাবুডুব খেয়ে বিজ্ঞামনস্ক হওয়া শক্ত। কোনোরকমে যান্ত্রিকভাবে বিজ্ঞানমনস্কতার নীতিগুলি মুখস্থ করলেও তা বাস্তবে প্রয়োগ করা এদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারে এদের ভূমিকা অর্থহীন হয়ে পড়ে, এবং কখনো কখনো এরা সমাজবিরোধীর ভূমিকাও পালন করেন।

ব্রাজিলে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বসুন্ধরা বৈঠকে দাবি উঠল যে ২০০০ সালের মধ্যে প্রতিটি দেশ তাপবর্দ্ধক গ্যাসের উৎপাদন কমিয়ে ১৯৯০ সালের স্তরে নামিয়ে আনুক, তা না হলে জমা বরফ গলবে, সমুদ্রের জলস্তর উঁচুতে উঠে প্লাবন আনবে, খরার প্রকোপ বাড়বে, মরুভূমি বিস্তৃত হবে, কৃষি উৎপাদন কমবে ইত্যাদি ইত্যাদি; তা ছাড়া 'ওজোন' স্তরে ফুটো হওয়ার বিপদ তো আছেই। শুধু আমেরিকাই বছরে ২৩ শতাংশ তাপবর্দ্ধক গ্যাস বাতাসে ছাড়ে। মার্কিন সরকারি বিজ্ঞানীরা বলল—তাপবর্দ্ধক গ্যাস উৎপাদন কমানোর কোনো দরকার নেই, তার চেয়ে যদি ২০০০ সালের মধ্যে জঙ্গল কাটা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলেই পৃথিবীর তাপমাত্রা কমানোর লক্ষ্য অর্জন করা যাবে। উভয় মতই বিজ্ঞানসম্মত কিন্তু কায়দাটা বুঝুন। আমেরিকায় জঙ্গল নেই, জঙ্গল প্রায় সবটুকুই তৃতীয় বিশ্বে, যেখানে জঙ্গলের অর্থ বাগান-বিলাসিতা বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ নয়, জঙ্গলের উপর নির্ভর করে অসংখ্য গরিব মানুষের খাওয়াপরার সংস্থান। এখানে পরিবেশবিজ্ঞান কার পক্ষে রায় দেবে? বিজ্ঞানমনস্কতা এক্ষেত্রে কোন কাজেই আসবে না। প্রশ্নটা আসলে নয়া-সাম্রাজ্যবাদ বনাম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা নিয়ে, বিজ্ঞানের নয়। দেশের কথায় আসুন। নর্মদা বাঁধ প্রকল্পের ফলে বনাঞ্চল ধ্বংস ও বনবাসীদের বাস্তুলোপের কথা সরকারি বিজ্ঞানীরা শুনতেই চাইছে না। পরমাণু বিদ্যুৎ প্রকল্পের ফলে নিরীহ নাগরিকের স্বাস্থ্যহানির বৈজ্ঞানিক তথ্যকে বিজ্ঞানীরাই পাত্তা দিচ্ছে না। ভোপালের গ্যাস বিপর্যয়ে রুগ্ন মানুষদের রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসার বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুধু কাগুজে উদ্যোগের মধ্যে বেঁধে রাখা হলো। অথচ এইসব কাজের যোগ্য বিজ্ঞানী ও গবেষণা-প্রতিষ্ঠানের অভাব এদেশে নেই। অভাব আসলে নৈতিক মূল্যবোধের। যে সরকারি কর্তৃপক্ষ, শাসক মহলের যে সব কর্তাব্যক্তিরা বিজ্ঞানীদের দিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এইসব জনস্বার্থবিরোধী প্রকল্প একটার পর একটা চালিয়ে যাচ্ছে, তারাই পাশাপাশি কোটি কোটি সরকারি টাকা খরচ করছে জনগণের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের জন্য এবং এই উদ্যোগে সামিল করছে গণবিজ্ঞান কর্মীদের যারা নিজেদের প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক বলে মনে করে। গণবিজ্ঞান কর্মীরা যদি এই কাজে শুধু বিজ্ঞানমনস্কতার কথা মনে রাখেন ও নৈতিকতার দিকটা ভুলে যান তাহলেই চিত্তির, তাহলে ঐ বিজ্ঞামনস্কতা টিকবে না। আমাদের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরাও বিজ্ঞানমনস্কতার শিক্ষা পান নি এমন নয়, এখনো পেয়ে থাকেন কিন্তু তা টেকে না, অনৈতিকতার দেওয়ালে ধাক্কা লেগে তা ছিটকে বেরিয়ে যায়। এটা যে শুধু বাঙালি বা ভারতীয়দের বিশেষত্ব তা নয়, এমন কি তৃতীয় বিশ্বের বর্ণময় মানুষদেরও একচেটিয়া নয়, ইউরো-মার্কিন বিবর্ণ মানুষদের দেশে বাঘা বাঘা বিজ্ঞানমনস্ক বিজ্ঞানীরাও বর্ণবিদ্বেষের মূল্যবোধে বিশ্বাস করে, যদিও তা অবৈজ্ঞানিক। সমস্যাটা সেই নৈতিক মূল্যবোধের।

বিজ্ঞানের প্রচার বা জনপ্রিয়করণ এবং বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পার্থক্য একটা আছে এবং সেটা এইখানেই। গণবিজ্ঞান আন্দোলনের মূল প্রেরণা ও চালিকাশক্তি নৈতিকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা হলো হাতিয়ার। নৈতিকতা বাদ দিলে তখন আর সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে পার্থক্য থাকে না। (উৎস মানুষ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯২)

উমা

Declaration

বিধিসম্মত ঘোষণা

প্রকাশক	:	বরুণ ভট্টাচার্য (সা.)
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৬৪
প্রকাশস্থান	:	ঐ
স্বত্বাধিকারী	:	সচিব, 'উৎস মানুষ' সমিতি (বরুণ ভট্টাচার্য)
ঠিকানা	:	বি ডি ৪৯৪, সল্ট লেক, কলকাতা ৭০০০৬৪
মুদ্রক	:	বরুণ ভট্টাচার্য
মুদ্রণস্থান	:	শান্তি মুদ্রণ ৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯
সম্পাদক	:	সমীরকুমার ঘোষ (সা.)
জাতি	:	ভারতীয়
ঠিকানা	:	ঐ

আমি এতদ্দারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরিউক্ত তথ্যগুলি আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানানুসারে সত্য।

স্বাঃ বরুণ ভট্টাচার্য

প্রকাশক

বিংশ শতাব্দী শেষের ভাবনা

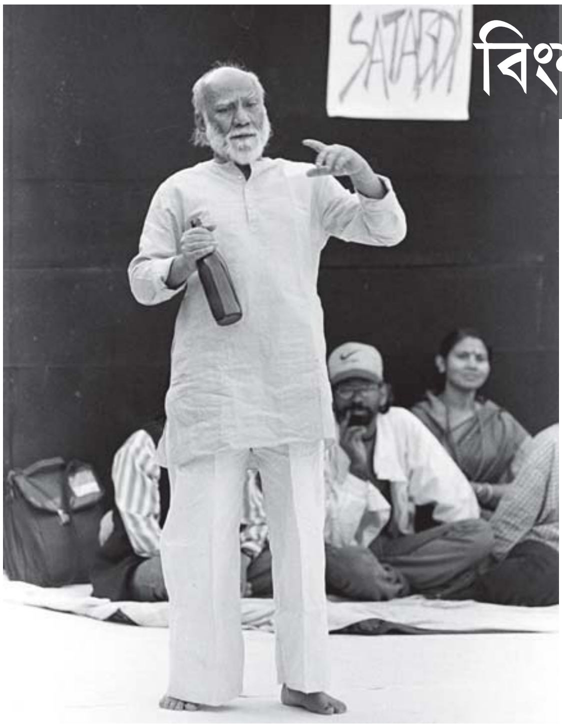

বাদল সরকার (১৯২৫-২০১১)

সাক্ষাৎকারভিত্তিক আলোচনা

সংকলন- **প্রদীপ দত্ত**

সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ বিষয়ে বই পড়া এক ব্যাপার, আর চোখের সামনে যেসব ঘটনা দেখতে পাই তা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। সেসব বুঝতে গেলেও অবশ্য বই পড়তে হয়।

ক'দিন ধরে দেখলাম, একটা সম্পূর্ণ ভুল অঙ্ককে ভুল জেনেও সাড়া পৃথিবীতে সবাই মিলে কেমন সত্যি করে দিল। প্রায় জার্মানিতে যেমন ফ্যাসিবাদের সময় হ'ত। একটা মিথ্যেকে যদি অনেকদিন ধরে বারবার বলা যায় তাহলে লোকে তাই-ই সত্যি বলে মনে করবে। এই তত্ত্বকে ভিত্তি করে প্রচার—জার্মান জাতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি, ইহুদিরা সব নিচে, ইত্যাদি। তাই-ই সেদেশের মানুষ বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল। জার্মানির মত দেশ, যেখানে শ্রমিকশ্রেণী এত বেশি সচেতন ছিল যে মার্কস বলেছিলেন, ওইখানে বিপ্লবটা হবে—সেই জার্মানিকেই অমনি করে দিয়েছিল তো!

এই বছরটা হল বিংশ শতাব্দীর শেষ বছর। মোটেই নতুন সহস্রাব্দের প্রথম বছর নয়। কিন্তু রাতারাতি মিথ্যে প্রচার করে, যাকে বলে হাইপ, আজকাল হাইপ কথাটা বেরিয়েছে, কেবল বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করে একটা ভুল অঙ্ককে ঠিক বলে চালিয়ে দিল।

ভাবছিলাম মানুষ তো এত বোকা নয়! সারা পৃথিবীর মানুষ, আমেরিকার ধুরন্ধর সব লোকেরা কি সব বোকামি করল? তারপর দেখি সেই প্রফিট মোটিভই কাজ করছে। এই যে মিলেনিয়াম উৎসব—কতগুলো বিগ বিজনেসের ব্যাপার বল তো? কত হোটেলে কত উৎসব, কত মদ বিক্রি হবে, কত গানবাজনা, কত ক্যাবারে হবে, কত খাবার বিক্রি হবে? সোজা কথা বিগ বিজনেসের লাভ প্রচুর বেড়ে গেল। মিলেনিয়াম পিছিয়ে দিলে প্রফিট মোটিভের চলে না। এখন লাভ করব, তারপর বলব, আগেরটা ভুল হয়েছে। আবার একবার মিলেনিয়াম পালন করব, আরেক চোট টাকাকড়ির খেল হবে। 'অবাক হয়ে দেখলাম পশ্চিমবঙ্গ সরকারও টেলিগ্রাফ পত্রিকাতে রবীন্দ্রনাথকে কোট করে বড় বিজ্ঞাপন দিয়েছে—আবাহন করছে, বরণ করছে নতুন সহস্রাব্দকে।'

তারপরে যেমন ধর এই যে 'ভ্যালেনটাইন ডে'। এটা কি আমাদের সংস্কৃতিতে, ভারতবর্ষে কস্মিনকালেও ছিল? বড় ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে এসব চালু করছে। আমরা না বুঝে তাই নিয়ে মাতছি, আমাদের বোকা বানিয়ে টাকাপয়সা লুটে নিচ্ছে ওরা।

ইংরাজিতে যাকে ফ্যান্টম বলে সেই বড় বড় কমিক স্ট্রিপগুলো যদি একটু মন দিয়ে পড় তাহলে দেখবে যে বেশির ভাগ কমিক স্ট্রিপই খুব বোকা বোকা। যেমন ধর অরণ্যদেব। অরণ্যদেবে না আছে হিউমার না আছে কিছু। ভাবতাম, লোকে অরণ্যদেব পড়ে কী করে? যিনি অরণ্যদেব তৈরি করেছেন তিনি কিন্তু বোকা নন। এ হচ্ছে একটা 'কাল্ট অভ ইডিয়সি' তৈরি করা। তুমি ভাবনা-চিন্তা করবে না এবং এই ধরনের বোকা ব্যাপার মানতে মানতে যদি তোমার চর্চাটাও ওইরকম হয়ে যায় তাহলে প্রশ্ন করাও বন্ধ হবে। মনে হবে সব কিছু ঠিকঠাক চলছে। আর তাহলেই প্রফিট মোটিভ-এর সুবিধা। প্রশ্ন করলেই মুশকিল। বহুদিন ধরেই এইরকম চলছে।

অথচ যাঁরা তা তৈরি করেন তাঁরা যে পুঁজিপতিদের সাহায্য করার জন্যই পরিকল্পনা করে লিখছেন তা বোধহয় নয়। এঁদের তৈরি করা জিনিসগুলো নিয়ে হাইপ করা হচ্ছে, বেশি প্রচার পাচ্ছে। ফলে একটা ভিশিয়াস সার্কল তৈরি হয়। যাঁরা তৈরি করছেন তাঁরা বেছে নিচ্ছেন—কোনটা করা নিরাপদ, কোনটার বাজার আছে। বাজারটা চালায় কিন্তু স্বার্থবাদীরা, কিন্তু কোনও দিনও প্রশ্ন ওঠেনি—এই ইডিয়টিক জিনিস এতদিন ধরে চলে কেন?

আমেরিকায় আমাদের মত কড়া অস্ত্র আইন নেই। সেখানে

লোকে চোর, ডাকাত ঠেকাবার প্রয়োজনে অস্ত্র কিনতে পারে। বারো-চোদ্দ বছরের স্কুলের ছাত্র পিস্তল দিয়ে কয়েকজনকে গুলি করে মেরে ফেলল। তারপর তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হল। এইরকম করার পেছনে কী মানসিকতা কাজ করে তা সন্ধানের চেষ্টা হল। সমস্ত কারণেরই বিশ্লেষণ হল, শুধু একটি কারণের কথা প্রায় বলাই হল না। সিনেমায়, টিভি-তে অ্যাকশন পিকচার্স-এ কী দেখছে এই কিশোর-কিশোরীরা? সেখানে তো ধ্বংসের আনন্দে ধ্বংস, খুনের আনন্দে খুন হচ্ছে। এর প্রভাব নিয়ে ঢি ঢি পড়ে যাবার কথা ছিল।

ওদের দেশের ছবি নকল করেই কিন্তু আমাদের বলিউডে ছবি তৈরি হয়। কিন্তু সিনেমায় অহেতুক এই হিংসা প্রদর্শনের ফলটা কি আমরা চারপাশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কখনও কখনও দেখতে পাচ্ছি না?

যাঁরা ছবিটা তুলছেন, যে ডিরেক্টর ছবি তৈরি করছেন, তিনি যে পরিকল্পিতভাবে হিংসার প্রচার করছেন তা কিন্তু নয়। তিনি দেখছেন বাজার আছে—তাই তুলছেন। কিন্তু স্বার্থবাদীরা বাজারটা যে রেখেছে তার তো কিছু কারণ রয়েছে? সেক্সের ব্যাপারে সেন্সর হয়, কিন্তু ভায়োলেন্সের ব্যাপারে কেন সেন্সর করা হয় না? কারণ যখন যুদ্ধের জিগির উঠবে, একটু ঘুর পথে তখন এই হিংসার ব্যাপারটা কাজে দেবে। লোককে একেবারে বোকা বানিয়ে ছেড়ে দেওয়া যাবে। কার্গিলের কথাই ধর, দেশপ্রেমের একটা জিগির মানুষের মধ্যে ছিল, ফলে লোককে দিয়ে যা খুশি তাই ভাবিয়ে ছেড়ে দিল।

সরকারি চাকরি করতে গিয়ে যাঁরা মারা যাবেন তাঁদের দায়িত্ব সরকারের। সেনাবাহিনীতে যাঁরা ঢোকেন তাঁরা জানেন যে—মাইনে পাব বটে তবে যখন তখন মরতেও হতে পারে। এরপর যদি যুদ্ধে তাঁদের কেউ মারা যান তার জন্য দেশের লোক দায়ী হবে কেন? দেশশুদ্ধ লোকের কাছ থেকে চাঁদা তোলা হবে কেন?

ভায়োলেন্সের কার্ডটা যুদ্ধের সময় ভীষণ কাজে লাগে। শত্রুকে মেরে ফেলব, দেশের জন্য জীবন দেব—এই জিগির ওঠানো যায়। কার্গিলে যারা প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্য আমরা গর্বিত, ব্যথিত। সেই সমবেদনা কিন্তু উড়িষ্যার সুপার সাইক্লোনের ব্যাপারে নেই। কার্গিলে ক'জন মরেছে? সরকারিভাবে তিন-চার হাজার। আর উড়িষ্যায়? বন্যা বছর বছর হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু সমবেদনা হয় না। ভূমিকম্প হচ্ছে, বন্যা হচ্ছে, শহর কে শহর ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে—তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই কিন্তু!

ব্যাপারটা হচ্ছে, কার্গিল মানে—সময় আসবে, হুকুম হবে, তুমি যুদ্ধকে সমর্থন করবে, যুদ্ধ ফান্ডে চাঁদা দেবে। এগুলোর পেছনে মতলব নেই ভেবেছ? মতলব ঘুরে ফিরে সেই প্রফিট মোটিভেশন—পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করার পেছনে কাজ করে।

ভারত, পাকিস্তানের বোমা বিস্ফোরণেও আমেরিকার স্বার্থ নেই আমি তা বিশ্বাস করি না। আমেরিকার বক্তব্য, ভারত এমন কায়দা করে কাজ করেছে যে, ঠিক যে-সময় পাহারাদার উপগ্রহের নজর ছিল না তখনই টুকটুক করে কাজ সেরে নিয়েছে। ফলে উপগ্রহ চিত্রে তা ধরা পড়ে নি। তারা কবুল করেছে—এটা আমাদের ব্যর্থতা। ন্যাকা কথা বলে মনে হয় আমার। যাই হোক, এর জন্য ওদের নজরদারি ব্যবস্থা, সি আই এ ইত্যাদির খুব সমালোচনা হল। তারপর আমেরিকা চিৎকার করে ভারতকে গালাগাল দিতে শুরু করল।

এরই মধ্যে ছোট্ট একটা খবর প্রকাশিত হয়। এই যে ব্যর্থতা, তার জন্য সি আই এ-তে এক হাজার নতুন নিয়োগ করা হচ্ছে। সি আই এ-র একেকটা লোকের জন্য কম টাকা খরচ হয় না। অন্যদিকে সি আই এ-র হিসবে কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর কারুর দেখবার অধিকার নেই। এই তালে গোয়েন্দা ব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্য একটু আত্মনিন্দা করে সি আই এ-তে এক হাজার নতুন নিয়োগ করা হল। বোধহয় সেইদিনই আমি নিশ্চিত হয়েছি, আমরা যে বোমা ফাটাব আমেরিকা সে কথা আগেই জানত।

ভারত, পাকিস্তানের মধ্যে কোনও দেশ অন্যের ওপর বোমা ফেলুক সেটা আমেরিকা নিশ্চয়ই চায় না। কিন্তু দু'দেশের মধ্যে উত্তেজনা থাকুক তা তারা চায়। বোমাটা থাক, পারস্পরিক হুমকি হোক, মধ্যে মধ্যে কার্গিল হোক। কেননা আমেরিকার অস্ত্র বিক্রির স্বার্থ এর সাথে জড়িত। তাদের দেশের অস্ত্র কারখানাগুলো বন্ধ করে দিতে হলে তাদের মুশকিলে পড়তে হবে। তাদের দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলো ভীষণ শক্তিশালী। ফাটাফাটি হয়ে যাবে। শ্রমিক সমস্যা দেখা দেবে। মার্কিন অস্ত্র কারখানার শ্রমিক ও যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত শিল্প শ্রমিকেরা ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতিকে সমর্থন করেছে নিজেদের স্বার্থে। ওদিকে তৃতীয় বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণী মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, ভিয়েতনামের পক্ষে ছিল।

ইরাকের যুদ্ধে অনেকগুলো ক্ষেপণাস্ত্র খরচ হল। কোটি কোটি ডলার লোকসান। আমেরিকার গোটা অর্থনীতির কথা ভাবলে তা কিন্তু লোকসান নয়। যুদ্ধে ক্ষেপনাস্ত্র খরচ করলে দেশের অস্ত্র কারখানাগুলো চাঙ্গা হয়, ফের জোর কদমে অস্ত্র উৎপাদন চলতে থাকে। পৃথিবীব্যাপী সন্ত্রাসবাদকে হৈ হৈ করে গালাগাল করছে আমেরিকা। অথচ তারা পরোক্ষে কিন্তু সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করছে। কেননা সন্ত্রাসবাদীরা ভাল অস্ত্র ক্রেতা। নানান ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র আসছে কোথা থেকে? এল টি টি ই অত্যাধুনিক অস্ত্র পাচ্ছে কোথায়? অস্ত্র জোগান দিতে হবে, আবার সন্ত্রাসবাদ বন্ধও করতে হবে। পরমাণু বোমা তৈরি করতে সাহায্য করতে হবে, পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের অনুমতি দিতে হবে। আবার তার প্রয়োগ বন্ধ করতে হবে। কিন্তু মুশকিল

হচ্ছে এসব কাজে প্রথমে মদত দেওয়ার পর তা বন্ধ করা খুবই শক্ত।

বাষট্টিতে চীন-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে খবরের কাগজ প্রমাণ করে দিয়েছিল যে চীন বরাবরই অসভ্য জাত। অথচ তার কিছুদিন আগে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে চীনা শিল্পকলার বিরাট প্রদর্শনী হয়েছিল। সে সময় যে কাগজ চীনের পুরনো সভ্যতা নিয়ে ভালো ভালো কথা বলেছে সেই খবরের কাগজই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে চীন একটা অসভ্য জাত, আগ্রাসী, যুদ্ধবাজ। কেন না, আমাদের দেশাত্মবোধ জাগ্রত করতে হবে। দেশাত্মবোধ জাগ্রত করার ব্যাপারে মিডিয়ার মত ব্যাপার তো আর নেই।

তবে বিগ বিজনেসের যা স্বার্থ খবরের কাগজের সম্পাদক সেই লাইনে ভাবছে এরকম প্রায়শই হয় না। কিন্তু কিরকম সব অদৃশ্য দড়ি-বাঁধা আছে। তুমি চটাতে পারবে না। একটা হাওয়া মেনে চলতে হবে। কার্গিল একটা হাওয়া তৈরি করেছিল। হাওয়াটা মানতে হয়েছে। বিজ্ঞাপন ছাড়া কোনও খবরের কাগজের চলে না। কাগজকে তাই বিগ বিজনেসের কথা শুনতে হয়। তবে যে একেবারে ধামাধরা তা কিন্তু নয়। ব্যাপারটা বেশ জটিল। কিন্তু মোটামুটি যা দাঁড়ায়—যারা শাসক শ্রেণী বা শাসক শ্রেণীর বাবা বিগ বিজনেস, পুঁজিপতি—তারা যা চাইছে সংবাদ মাধ্যম মোটামুটি তাই প্রচার করে যাচ্ছে। কয়েকটা বিরোধী খবরের কাগজের কথা ছেড়ে দাও, মোটামুটি ওই জিনিসই চলছে।

সিধে বাংলায়, পাকিস্তানের সাথে ভারতের রাজনৈতিক সুসম্পর্ক থাক তা আমেরিকা চায় না। ভারত পাকিস্তানের মিলমিশ হয়ে গেলে তো মুশকিল আছে। আমাদের দেশের ওপর পুরো কব্জা রাখতে গেলে দেশের অভ্যন্তরীণ বিরোধগুলো জিইয়ে রাখা তাদের দরকার। যদি সকলে ভাব করে ফেলে, সাম্রাজ্যবাদ তাহলে আর কতদিন চালানো যাবে? আর আমরা যদি পরস্পরকে শত্রু মনে করি, তাহলে আমেরিকা যে আমাদের দু'দেশেরই শত্রু, ডলার দেখিয়ে আমাদের ভাগ করা হচ্ছে—এসব কথাই উঠবে না।

এটা কিন্তু আজকের ব্যাপার নয়। 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' কথাটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আমলেই বলতে বলতে পচে গেছে। কিন্তু আজও যা চলছে তা ডিভাইড অ্যান্ড রুল নয় কি? সে তোমার ইরাক-ইরানের সম্পর্কই ধর, কি ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কই হোক। যত আমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে দুর্বল হব আমেরিকার ততই সুবিধা।

অন্যদিকে কি ভারত কি পাকিস্তান পরস্পরের বিরোধী কোনও একটা পদক্ষেপ নিয়েই তারা তাকিয়ে থাকে আমেরিকার দিকে—আমেরিকা সেটা সমর্থন করছে কি করছে না। সমর্থন করলেই হৈ হৈ করে সে কথা খবরের কাগজে বেরবে—আমাদের ভালো বলেছে, আমাদের কাজ ঠিক বলেছে। নির্লজ্জের মত আমরা এসব করি। দুঃখ করে বলি পাকিস্তানের অমুক পদক্ষেপ আমেরিকা সমর্থন করছে। ভেবে দেখ, আমেরিকার সমর্থন কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থাটা আমেরিকাই করে রেখেছে।

ব্রিটিশ আমলে অস্ত্র আইন খুবই কড়া ছিল। ত্রিশের দশকে যাঁরা সশস্ত্র আন্দোলন করেছেন তাঁদের একটা পিস্তল জোগাড় করতে দম বেরিয়ে যেত। আজ কিন্তু উন্নত অস্ত্র হাতে ডাকাতি হচ্ছে, রাহাজানি হচ্ছে। অস্ত্রগুলো আসছে কোত্থেকে? ত্রিশের দশকে কেন পারা যায় নি? তার মানে কেউ না কেউ অস্ত্র বেচছে। এইসব অস্ত্র কিন্তু দু-এক বছর পরই পুরনো হয়ে যায়। অস্ত্র প্রতিযোগিতায় থাকতে গেলে পুরনো অস্ত্র ক্রমাগত বদল করতে হয়। তখন সেই পুরনো অস্ত্রগুলোর কি হবে? বেচতে হবে। কাকে বেচবে? সন্ত্রাসবাদীকে বেচ, ডাকাতকে বেচ; ব্যাপারটা ঠিক পরমাণু চুল্লির মত। ইউরোপ, আমেরিকা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য বন্ধ করে দিচ্ছে তাদের চুল্লি প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি আমাদের তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে বেচে দিচ্ছে। আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে—পরমাণু বিদ্যুৎ ভীষণ জরুরি। তা না হলে আমাদের প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে না।

তারপরে ধর, চাষী যদি সেচের কাজ, সার কেনা, বীজ কেনা ইত্যাদির জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা ধার পেত তাহলে দশ বছরের মধ্যে সুদসহ আসল টাকাটা শোধ করে দিতে পারত এবং কৃষির উন্নতি হত, উৎপাদন বাড়ত। কমপ্রিহেনসিভ এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের সময় এটা দেখা গেছে। অথচ বিভিন্ন বিদেশী সংস্থা যে সাহায্য দেয় আমাদের, তার বেশির ভাগই কিন্তু শহরের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্যই। পাতাল রেল শুরুর সময় হিসেব কষে দেখা গেছে—পাতাল রেলের চলতি খরচটা তুলতে গেলে ন্যূনতম ভাড়া করতে হবে যাত্রী প্রতি পঁচাশি পয়সা। তখন বাসের ন্যূনতম ভাড়া ছিল দশ পয়সা। তার মানে কতটা ভর্তুকি দিতে হবে চলতি খরচে! তারপর যে টাকা ধার নিয়ে পাতাল রেল করলাম সে টাকা শোধ দেবে কে? তার মানে পাতাল রেল করার জন্য আমরা ওদের কাছে, মানে ডলারের কাছে, বেশ খানিকটা বাঁধা হয়ে গেলাম। এই দেনা আমরা শোধ করতে পারব না। এই করে করে দেশটাকে আমরা বিক্রি করেছি। এই হিসেবে পাতাল রেল একটা ক্রিমিনাল প্রজেক্ট। পাতাল রেল করার সময় আবার ওই হাইপ কী পরিমাণে যে হয়েছিল! এমন একটা জিনিস হতে চলেছে যার নাকি তুলনা হয় না। আমরা খুব গর্বিত। যারা গ্রামে থাকে, জীবনে কোনওদিন পাতাল রেল চড়বে না, তারাও গর্বিত, প্রচার তাদের গর্বিত করে ছেড়ে দিয়েছে।

পুরনো ঔপনিবেশিক শহরগুলোর রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর কোনও কোনও ক্ষেত্রে ইউরোপ আমেরিকার সাথে তুলনীয়। অথচ শহরের একটু বাইরে গেলেই মনে হবে যেন দুশো বছর পিছিয়ে আছি। শহরে যে টাকা ঢালা হয়, আমাদের মত ঔপনিবেশিক দেশগুলোর দমে কুলোবে না সে টাকা শোধ করে। আর টাকা

শোধ করতে না পারলেই কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। আবার বিদেশী সংস্থার টাকা মানে তো ঘুরে ফিরে আমেরিকারই কব্জা।

এসব কথাই 'ভোমা' নাটকে আছে। ভোমা লিখেছিলাম ১৯৭৪ সালে। তাতে ছিল—যা পাচ্ছি শতকরা তার ষাটভাগ পুরনো দেনা সার্ভিস করতে চলে যাচ্ছে। বাকি চল্লিশ ভাগ আমরা কাজে লাগাতে পারছি। ধীরে ধীরে ষাটটা হয়ে যাচ্ছে পঁয়ষট্টি, তারপর সত্তর। এরকম করতে করতে একটা অবস্থায় ভোমাতে বলেছিলাম—এরপর থেকে একশো ডলার ধার করে একশো ডলারই শোধ দেব। মজা হল সেই অবস্থায় পৌঁছে গেছি আর কি! তার মানে কি? তার মানে পলিটিকাল সাবসার্ভিয়েন্স—রাজনৈতিক অধীনতা। তাই তো হচ্ছে এখন। কীভাবে আমরা দেশ চালাব তা ঠিক করে দিচ্ছে আমেরিকা।

নানা কথা মাথায় আসে। অন্য একটা কথা বলি।

নাস্তিক কথাটার মানে যদি হয় ভগবান না মানা, তাহলে আমি ছোটবেলা থেকেই নাস্তিক। তবে যাকে বলে অ্যাগ্রেসিভ নাস্তিক আমি তা ছিলাম না কখনো। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে, প্রধানত বাবরি মসজিদের ঘটনার পর থেকে আমি কিন্তু ভীষণভাবে অ্যাগ্রেসিভ নাস্তিক। আমার অবাক লাগে; উৎস মানুষকেই প্রশ্ন করতে চাই, ধর্মকে সরাসরি কেন কেউ খারাপ বলে না?

প্রত্যেক ধর্মই খারাপ। শুরুতে প্রায় প্রতিটি ধর্মেরই একটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল। সে যিশুখ্রিস্টই বল, হজরত মহম্মদই বল, আর বুদ্ধদেবই বল। প্রত্যেক জায়গাতেই তখনকার সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, নির্যাতিতদের পক্ষে একটা লড়াই ছিল। তারপর শাসক শ্রেণী ধর্মকে অন্য জায়গায় এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আজ ধর্মের নামে পাপ করা হচ্ছে না এমন তো কোথাও দেখি না। ধর্মের মধ্যে আজ ইতিবাচক কিছু একেবারেই নেই।

এত দল আছে, নানান রকম হচ্ছে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ আছে, মুসলমানদের কি জামাত-টামাত আছে, সব দলের একটা করে ধর্মীয় সংস্থা রয়েছে। নাস্তিকদের কোনও দল নেই—যার কাজ হবে শুধু নাস্তিকতার প্রচার করা। উৎস মানুষের বাৎসরিক আড্ডায় হয়তো এ বিষয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এটা নিয়ে উঠে পড়ে প্রচার হয় না তো! কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে। কিন্তু বেশির ভাগ কুসংস্কারের মূল তো ধর্ম—সেটাকে বাঁচিয়ে রেখে কুসংস্কারকে আক্রমণ করা হচ্ছে। প্রগতিশীল কাগজ ধর্ম নিয়ে উঠে পড়ে লেখে না কেন? জানি উদ্যমের অভাব আছে, সংগঠনের অভাব আছে। তবে সাহসেরও অভাব আছে বোধহয়।

উৎস মানুষ---মার্চ-এপ্রিল ২০০০

বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
(১৯৪২-২০১১)

'উৎস মানুষ'-এর সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল পত্রিকার ঠিকানা। ঠিকানা দিয়েছিলেন যিনি—তাঁর নাম বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। এখনও 'বি ডি-৪৯৪, সল্টলেক', পত্রিকার ডাক-পরিচয়। 'উৎস মানুষ' পত্রিকার শুভাকাঙ্ক্ষী— গত ১১ এপ্রিল ২০১১ হঠাৎ হৃদরোগ তাঁকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নেয়।

বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কোনোদিন উৎস মানুষের কোনো বৈঠকে, আড্ডায় আসেন নি। তাই তাঁকে অনেকেই চেনেন না। কিন্তু তিনি নীরবে, অলক্ষ্যে থেকে সাহায্য করেছেন, যাবতীয় উপদ্রব সহ্য করেছেন, প্রশ্রয় দিয়েছেন পত্রিকাকে বেড়ে উঠতে। তিনি না থাকলে গর-ঠিকানা হয়ে যেত 'উৎস মানুষ' এমন কথা বলাই যায়। কারণ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও তখন স্থায়ী ঠিকানা ছিল না। বিপ্রদাস সম্পর্কে অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাদা ছিলেন। দাদাসুলভ স্নেহ তাই বরাবর পেয়েছে পত্রিকাও। প্রতিটি সংখ্যা পড়তেন। মন্তব্য করতেন কাছের জনের কাছে। ভাই আগেই প্রয়াত হয়েছে। গত সংখ্যায় ভাইয়ের (অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়) যে লেখাটি পুনর্মুদ্রিত হয়, তার ভূমিকাটা কে লিখেছেন জানতে চেয়েছিলেন, মৃত্যু তখন তার একদিন আগে দাঁড়িয়ে।

হিন্দু স্কুল থেকে স্কুল ফাইনাল। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে আই এসসি পাস করে শিবপুর বি ই কলেজ থেকে স্নাতক হন। ওয়েস্টবেঙ্গল পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ছিলেন সমাজ, রাজনীতি, বিজ্ঞান-সচেতন, যুক্তিবাদী একজন ব্যক্তি। তাঁর সচেতনতার সাক্ষর রয়ে গেছে 'দৈনিক স্টেটসম্যান', 'জ্ঞান বিজ্ঞান', 'ফলা' ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত নিবন্ধে। নাট্যজগতের সঙ্গেও সংযোগ ঘটেছিল অভিনয় ও নাটকের বই প্রকাশের মধ্য দিয়ে। বিজ্ঞাননিষ্ঠ হয়েও ভারতীয় ঐতিহ্য ও পরম্পরার প্রতি অনুরাগ ছিল ঐকান্তিক। জীবনের চলমানতায় ছিল গভীর আস্থা। তিনি ছিলেন পরিবর্তনের সমর্থক। বহুমুখী গুণের অধিকারী এই মানুষটিকে, আমাদের পরম সুহৃদকে সশ্রদ্ধ প্রণতি জানাই।

মহাভারতের সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টিতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ দেখতেন

সত্যিই কি তাই?

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেমন একদিকে জিন প্রযুক্তি, আণবিক জীববিদ্যা, সুপারকম্পিউটার, পায়োনিয়র, ভয়েজারের নাম শুনছি, অপরদিকে তেমনি বিজ্ঞানের নামেই অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞানের একটি ধারা চলেছে টেলিপ্যাথি, পরামনোবিদ্যা, জাতিস্মরবাদ, ইউফো, দানিকেন, বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের নাম নিয়ে। ফলে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে শুধু শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত সাধারণ মানুষই নন, অনেক বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষও বিভ্রান্ত হচ্ছেন। অথচ এটা হবার কথা নয়। একটু চোখ মন খোলা রাখলে এগুলোর আসল রহস্য বেরিয়ে আসে। বিজ্ঞানের নামে সেই ফাঁকি, প্রতারণাটা চলছে কোথায় তা দেখানোর জন্য এই আলোচনা—বিশেষ করে সাধারণ মানুষ যাতে বুঝতে পারেন সেদিকে লক্ষ্য রেখে। আজকের আলোচনা 'টেলিপ্যাথি'।

বাসটা বৌবাজারের মোড়ে এসে ব্রেকডাউন হয়ে গেল। কিরকম রাগ হয়! কিছুক্ষণ দাঁতে দাঁত ঘষে, ব্যাজার মুখে স্টপেজে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে খেয়াল হল সামনের গলিতেই বন্ধুর বাড়ি। বেচারা পা ভেঙে পড়ে আছে অনেকদিন। দেখতে যাওয়ার ফুরসত হয় না। যাই একবার ...। দরজা খুলে বন্ধু স্ত্রী হৈ হৈ করে ওঠে। ভেতর থেকে বন্ধুর চিৎকার—'দ্যাখ, একেই বলে টেলিপ্যাথি। এই মিনিটখানেক আগেই আমরা তোর কথা বলছিলাম। এরকম সময়ে তোর তো আসার কথাই নয়। টেলিপ্যাথি না হলে হয়, বল? ...' কী আর বলব! বাসটা না বিগড়োলে যে টেলিপ্যাথি হত না সেটা আর বলা যায় না তখন।

আধুনিক যুগে চলতি কথায় হাল্কা টোনে আখচার ব্যবহার হলেও 'টেলিপ্যাথি' বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন এক জনের কিছু ভাবনা বিনা যন্ত্রে বিনা মাধ্যমে, এমন কি বিনা নিয়মে আর একজনের মনের মধ্যে গিয়ে হাজির হওয়ার নাম টেলিপ্যাথি। সব ইন্দ্রিয়ের আওতার বাইরে চিন্তাশক্তির এই ভেসে যাওয়ার 'অতীন্দ্রিয়' ক্ষমতার ইংরেজি নাম 'Extra sensory perception' বা 'ই এস পি')। এ ছাড়াও বহু যোজন দূরের কোন ঘটনাকে ছবির মত দেখা বা অলোকদর্শন (clair voyance), ভবিষ্যতের কোন ঘটনাকে মনের চোখে আগেভাগে চিনে নেওয়া (precognition)—এগুলোও ই এস পি ক্ষমতার মধ্যে পড়ে। এরকম আশ্চর্য ক্ষমতার প্রদর্শকেরা স্বভাবতই সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা সমীহ আদায় করতে পারেন। সেই কারণে দেশে-বিদেশে বহু গুরু-বাবা-যোগী আর ক্ষমতাধর পুরুষের কাহিনী শোনা যায় যাঁরা টেলিপ্যাথি বা ই এস পি দিয়ে নাকি রোমাঞ্চকর ক্রিয়াকাণ্ড করেন।

কিন্তু কী এমন সেই 'অতীন্দ্রিয়' ক্ষমতা যা বিজ্ঞানের বিচারকেও টেক্কা দিতে চায়? আসুন, একটু খতিয়ে দেখা যাক।

মাঠে-ময়দানে মাদারির খেলা অনেকে দেখে থাকবেন, চোখ বাঁধা একটি ছেলে মাটিতে শুয়ে আশ্চর্য সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে—দূরের গাড়ির নম্বর কত, ঘড়িতে ঠিক কটা বাজে, কী রঙের জামা গায়ে ইত্যাদি,ইত্যাদি। মাদারি 'টেলিপ্যাথি' শব্দটার সঙ্গে পরিচিত নয়, সে দাবি করে 'স্বপ্নাদ্য মাদুলি'র গুণে ছেলেটির অলৌকিক ক্ষমতা এসেছে।

রাস্তাঘাটের খেলা বলে হয়ত মাদারি তেমন গুরুত্ব পায় না কিন্তু এরকমই টেলিপ্যাথির ক্ষমতা দেখিয়ে কোন বাবা কিংবা গুরু দৈব আদেশ জেনে নিতে পারে। কিন্তু কীভাবে হয়? মহাভারতের সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দৃশ্য ধৃতরাষ্ট্রের কাছে বসেই দেখতে পেত এবং তা অবিকল তুলে ধরত ধৃতরাষ্ট্রের সামনে। অতীন্দ্রিয়বাদীরা বলেন, এটা খুবই সম্ভব। ব্যাখ্যা হিসেবে দেন, মানুষের মস্তিষ্কে বিদ্যুৎকণারা ছুটে বেড়ায়। চিন্তার তরঙ্গকে কেন্দ্রীভূত করে 'ব্রেইন ওয়েভ'-এর সাহায্যে অন্যত্র পাঠাতে পারে একমাত্র অতীন্দ্রিয় শক্তিধর ব্যক্তি। আপাতভাবে এটাকে বিজ্ঞান-সুবাসিত ব্যাখ্যা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের চমক দিয়ে তো ভুলকে ঠিক করা যায় না। আধুনিক শারীরবিজ্ঞানে মস্তিষ্কের অনেক ক্রিয়াকাণ্ডের হদিস মিলে গেছে, অনেক তথ্য প্রামাণ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মস্তিষ্কের নিউরন আর তড়িৎ

সঙ্কেতের কাজ-কারবারও এখন জানা। কিন্তু মস্তিষ্ক-তরঙ্গ (brain wave) একজনের মাথা থেকে উড়ে গিয়ে বহুদূরের কোন গ্রাহক-মস্তিষ্কে হাজির হয় এটা একটা আজগুবি ব্যাপার। এটা অসম্ভব।

টেলিপ্যাথির অলৌকিক রহস্য অনেককাল ধরেই পৃথিবীতে বেশ জনপ্রিয়। আবার এর রহস্যভেদের ঘটনাও সমান তালে বাড়ছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অনুসন্ধানী বিজ্ঞানীরা টেলিপ্যাথিকে বাতিল করেন নির্দিষ্ট কয়েকটি কারণে। প্রথমত— টেলি যোগাযোগের বিষয়টা প্রায়শই কাকতীলায়। মনের যোগাযোগ হয়ে যায় হঠাৎই, সম্পূর্ণ লৌকিক কারণেই। শুরুতে বন্ধুবাড়িতে দুম করে চলে যাওয়ার কাহিনী বলেছিলাম। পা ভেঙে পড়ে আছে বন্ধু, অলস মনে কত কিছু ভাবে, প্রায়ই মনে মনে প্রত্যাশা করে আমাকে, আমার যাওয়াও হয় না। তারপর যেই গিয়ে হাজির হলাম, অমনি সেটা মনের সংযোগ বলে চিহ্নিত হয়ে গেল। আর একটা দৃষ্টান্ত দেখুন, বিদেশে পড়তে গেছে ছেলে। প্রায়ই তার দুশ্চিন্তা হয় মার শরীর নিয়ে। অকারণে মন অনিষ্ট আশঙ্কা করে। হঠাৎ একদিন দেশ থেকে টেলিগ্রাম পেল ছেলে—মা অসুস্থ (বয়স্কা মহিলা, অসুস্থ হওয়া অস্বাভাবিক নয়)। এটাকে টেলিপ্যাথি বললে কি ঠিক বলা হবে?

টেলিপ্যাথির দ্বিতীয় ঘাটতি হল—তত্ত্ব (theory) এবং প্রমাণের অভাব। কেন ঘটে, কীভাবে ঘটে, কোন সূত্র অনুসৃত হয়, এসবের কোন পদ্ধতিগত ব্যাখ্যা নিয়ে কথা বলেন না টেলিপ্যাথির প্রবক্তাগণ। তাঁদের বক্তব্য হল, বিজ্ঞানের নিয়ম সীমাবদ্ধ, তা দিয়ে সব ইন্দ্রিয়াতীত ক্ষমতার ব্যাখ্যা খুঁজতে যাওয়া ধৃষ্টতার পরিচয়। অথচ গবেষক অনুসন্ধানীরা ভুরিভুরি উদাহরণ এনে দেখাচ্ছেন, টেলিপ্যাথির প্রদর্শনীগুলো লোকঠকানো কৌশল মাত্র। ... রাস্তার ধারে মাদারিদের টেলিপ্যাথি যে দক্ষ সহকারীকে প্রশ্ন করার নিপুণ কৌশল সেটা বোধহয় অনেকে জানেন। ইউরি গেলার গোটা বিশ্বে এক চমক লাগানো নাম। দেড়/দু দশক আগে গেলার আমেরিকায় একের পর এক টেলিপ্যাথির আশ্চর্য প্রদর্শনী দেখাচ্ছিলেন। শেষে স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পরীক্ষায় ধরা পড়ে যায় গেলারের ফাঁকিবাজি। মুখের ভেতর খুদে রেডিও রিসিভার রেখে সহযোগীদের গোপন সাহায্য নিয়ে সে ক্ষমতা প্রদর্শন করত। ১৯৭৪-এর অক্টোবরে 'নিউ সাইন্টিস্ট' পত্রিকায় সে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ...লন্ডনের 'সানডে মিরার' পত্রিকা আয়োজিত আন্তর্জাতিক টেলিপ্যাথি পরীক্ষাও প্রচুর আলোড়ন তুলেছিল ১৯৭৩ সালে। লন্ডন আর নিউ ইয়র্ক-এর মধ্যে মনঃসংযোগ বা টেলিপ্যাথির দারুণ পরীক্ষা। কিন্তু এখানেও ফাঁকিবাজি ফাঁস হয়ে গেল। রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন জোসেফ হ্যানলন। সে খবরও ছাপা হয়েছিল নিউ সাইন্টিস্ট পত্রিকায়। এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

কাজেই বর্তমান যুগে টেলিপ্যাথি বা ই এস পি কেবল রহস্যপ্রিয় অন্ধবিশ্বাসী মানুষের কাছেই আস্থা আদায় করতে পারবে, বুদ্ধিমান বিজ্ঞানমনস্ক কোন ব্যক্তি একে গ্রাহ্য করবে না। প্রখ্যাত বিজ্ঞানলেখক মার্টিন গার্ডনার বলছেন—'টেলিপ্যাথি বা অনুরূপ অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার গুরুত্ব প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা হয়েছে নানা মহল থেকে, নানাভাবে। পরামনোবিদ্যার (Para-psychology) অন্যতম বিখ্যাত প্রবক্তা আমেরিকা ও ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোসেফ রাইন-এর বক্তব্য হল, এ শক্তির সম্ভাবনা বহুমুখী। ই এস পি বা টেলিপ্যাথিবিদ্যার চর্চা ঠিকমত করলে বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যাবে কেননা রাষ্ট্রগুলির সামরিক কৌশলের কোনকিছুই আর গোপন থাকবে না, মনের তরঙ্গে সব জানা হয়ে যাবে। এ যুক্তি কতটা সঙ্গত আর বাস্তবসম্মত তা বুঝতে হলে খুব বেশি বুদ্ধি ব্যয় করতে হয় না। ...

যুদ্ধের খাঁড়া আপাতত আমাদের ঘাড়ের ওপর নেই, আমরা বরং অধ্যাপক রাইন-এর যুক্তিটাকে অন্যভাবে প্রয়োগ করে দেখি। কল্পনা করা যাক কোন খবরের কাগজের এক অতীন্দ্রিয় চর্চায় পারদর্শী রিপোর্টার টেলিপ্যাথির জোরে মধু দন্ডবতের মনে উঁকি দিয়ে দুদিন আগেই জেনে নিলেন ৯০ বাজেটের চুম্বক তথ্যগুলো। অবস্থাটা কী দাঁড়াত ভাবুন তো! ... কিংবা যদি কল্পনাই করি তো বছর পাঁচ-ছয় পিছিয়ে যেতে আপত্তি কী! ১৯৮৪-র ২৯ অক্টোবর রাত্রে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে কোন এক খবরের কাগজ থেকে হট লাইনে খবর গেল—টেলিপ্যাথির নিখুঁত ছবি, আপনার আততায়ী নিরাপত্তা গেটের কাছে রাইফেল বাগিয়ে বসে আছে। ...ব্যস। বাকি নাটকটা রসিক পাঠক রচনা করে নিন।

আজকাল ২৬ মার্চ, ১৯৯০

সম্মানিত আশীষ লাহিড়ী

আমাদের পরম সুহৃদ আশীষ লাহিড়ী রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর এই সম্মান প্রাপ্তিতে আমরাও গর্বিত। তাঁকে আমাদের হৃদয়ের উষ্ণ অভিনন্দন জানাই।

উৎস মানুষ পরিচালকমণ্ডলী

পুস্তক পর্যালোচনা

ছিঁড়ে যাক মিথ্যার জাল

আশীষ লাহিড়ী

মহা ধূমধামে মাদার টেরেজার অন্ত্যেষ্টি-ভোজ মিটে যাওয়ার পর অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাড়নায় উৎস মানুষের একটি সংখ্যায় 'জ্যাঠামশাই বনাম মাদার' নামে একটা লেখা লিখেছিলাম। তাতে ক্যাথলিক চার্চের হয়ে সেবাকর্মে নিরত মাদারের বিপরীতে রেখেছিলাম রবীন্দ্রনাথের *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের নাস্তিক, পজিটিভিস্ট জ্যাঠামশাইকে। 'জগমোহনের নাস্তিক্যধর্মের একটা প্রধান অঙ্গ ছিল লোকের ভালো করা। সেই ভালো-করার মধ্যে না আছে পুণ্য, না আছে পুরস্কার না আছে কোনো দেবতা বা শাস্ত্রের বক্‌শিসের বিজ্ঞাপন বা চোখ-রাঙানি। যদি কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত "প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখসাধনে আপনার গরজটা কী" তিনি বলিতেন, কোনো গরজ নাই সেইটেই আমার সবচেয়ে বড়ো গরজ।'

গরজহীন, পুণ্যের লোভহীন যে-সেবা, সেটাই প্রকৃত সেবা। বাকিটা ব্যবসা। সে-ব্যবসা আর্থিক হতে পারে, পারমার্থিকও হতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের নিরন্তর প্রচারে লোকের মনে একটা ধারণা গড়ে দেওয়া হয়েছে যে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের সেবা করার মধ্যে কোনো অন্যায় নেই, সেটা খুব মহৎ কাজ। এই ধারণার মধ্যে যে-নৈতিক প্রবঞ্চনা রয়েছে সেটা রবীন্দ্রনাথ প্রায় একশো বছর আগেই *চতুরঙ্গ* উপন্যাসে (১৯১৬) দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর এই শ্রাদ্ধশতবর্ষে (ছাপার ভুল নয়) কথাটা নতুন করে মনে পড়ল ইংল্যান্ড-প্রবাসী বাঙালি ডাক্তার অরূপ চট্টোপাধ্যায়ের *Mother Teresa: The Final Verdict* (মিটিঅর বুক্‌স, কলকাতা, ২০০৩) বইয়ের সংক্ষেপিত বাংলা অনুবাদ *মাদার টেরেজা: মুখ ও মুখোশ* পড়তে গিয়ে (অনুবাদ ও সম্পাদনা: রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়, অমৃতশরণ প্রকাশন, কলকাতা ২০০৫, ফোন: ২৫৪৩-৪৩১৯, দাম নব্বই টাকা)। অরূপের ইংরেজি বইটি নানা দেশের শিক্ষিত মহলে যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছে। আমাদের সোনার পশ্চিম বাংলার গড্ডল-প্রবাহে অবশ্য তিনি প্রত্যাশিতভাবেই কার্যত অপরিচিত।

'সুখপাঠ্য ভারতের ইতিহাসে' সেটাই স্বাভাবিক। অরূপ দেখিয়েছেন, কলকাতার সাহেব-ভজা বাঙালি ভদ্রলোকদের হীনন্মন্যতা কীরকম সর্বব্যাপী। এই সেদিন দমিনিক লাপিয়ের-এর *সিটি অব জয়*-এর মতো একটি কুৎসিত, বিকৃতমনস্ক বইকে নিয়ে কলকাতার একদল লোক উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। বাংলা অনুবাদও বোধহয় বেরিয়েছিল। বইটি নিয়ে ছবি হয়েছিল। অরূপ জানিয়েছেন, বাঙালি-প্রেমী সুনীল গাঙ্গুলি তার পরামর্শদাতা নিযুক্ত হয়েছিলেন। হিমানীশ গোস্বামী তাঁর নিজস্ব ঢঙে লাপিয়ের-এর ঐ বইয়ের চরম হাস্যকর অস্বাভাবিকতা পরতে পরতে খুলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন (দ্রষ্টব্য *আনন্দনগরী এবং অন্যান্য দুঃখের কাহিনী*, দে'জ পাবলিশিং)। এ-ও দেখিয়েছিলেন, লাপিয়ের-এর আসল উদ্দেশ্য ছিল ক্যাথলিক চার্চকে কলকাতার মতো নরকের একমাত্র ত্রাতা বলে তুলে ধরা। হিমানীশদা জানাচ্ছেন, তাঁর ঐ বই নাকি দশ বছরে সাতাত্তর কপি বিক্রি হয়েছিল।

অরূপ দেখিয়েছেন, সাধারণ এক সন্ন্যাসিনী-শিক্ষিকা থেকে টেরেজা যে ক্যাথলিক দুনিয়ার এক আইকনে পরিণত হলেন, তার মূলে ছিলেন ম্যালকম মাগারিজ। এই ইহুদি-বিদ্বেষী মৌলবাদী ক্যাথলিক সাংবাদিকটির কলকাতার সঙ্গে পরিচয় অনেক দিনের। এমনকি কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গেও এঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। এঁরই সযত্ন পরিচর্যায়, প্রথমে বিবিসি রেডিয়োর, পরে অন্য বহু মাধ্যমের প্রচার মারফত টেরেজা কলকাতার কুৎসা রটিয়ে প্রভু ভ্যাটিক্যানকে সন্তুষ্ট করতে থাকেন। ঐটাই হয়ে ওঠে তাঁর ব্যবসায়িক ইউ এস পি—অনন্য বিক্রয়-বার্তা। তাঁর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে কলকাতার আহ্লাদে বাঙালিরা গদ্‌গদ হয়ে তাঁর নামে রাস্তা করেছে। কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে মাদারের ছবিতে কাছা-ও জুতো-খোলা বাঙালিদের প্রণামের ঘটা দেখলে কলকাতার এই সংবেদনহীন, শ্বেতাঙ্গপূজারী ভদ্রলোক সম্প্রদায় সম্বন্ধে করুণাও জাগে না।

মনশ্চিকিৎসক অরূপ একেবারে ডাক্তারি কেস স্টাডির ঢঙে মাদার টেরেজা নামক মহাঘটনাটির মনোবিকলন করে কতকগুলো সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন: টেরেজার সৌজন্যে 'পৃথিবীর ঘৃণ্য আঁস্তাকুড় হিসাবে পরিচিত' হওয়াটা কলকাতাবাসীর পক্ষে কতটা সম্মানের? টেরেজার বিপুল জনপ্রিয়তার মূলে আন্তর্জাতিক প্রচারমাধ্যমের 'বাহাদুরি' কতটা? টেরেজা কি দরিদ্রকে ভালোবাসতেন, নাকি দারিদ্র্যকে? এ ছাড়া টাকাপয়সা নয়ছয় নিয়ে মাথা-ঘুরিয়ে-দেওয়ার মতো নানান তথ্য তিনি তুলে ধরেছেন। ক্যাথলিক ধর্মের কর্মসূচির প্রধান অঙ্গ যেহেতু গর্ভপাত-বিরোধিতা, তাই অরূপের বইতে এ বিষয়ে যে বিস্তারিত বিবরণ থাকবে, সেটা স্বাভাবিক।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে তাঁর লেখার ধরনটা বোঝা যাবে। 'এক সময়ের (মার্কিন) প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী বব ডোল যখন দলের মধ্যে যথেষ্ট দক্ষিণপন্থী না হওয়ার জন্য সমালোচিত হচ্ছিলেন, তখন তিনি পকেট থেকে বের করলেন টেরেজা তাস; বললেন, গর্ভপাতের ব্যাপারে মাদার টেরেজা তাঁকে সমর্থন করেছেন' (পৃ২৯)। এমনকি 'উদারপন্থী' শ্রী ও শ্রীমতী ক্লিন্টন-ও 'টেরেজা

তাস' দাখিল করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। আর আগমার্কা রক্ষণশীল রোনাল্ড রেগ্যান যে টেরেজার পায়ে পড়ে যাবেন, এ তো জানা কথাই।

টেরেজোর ঐশ্বরিক সত্যনিষ্ঠার নমুনা: 'ক্যালিফোর্নিয়ার ক্রিপ্স ক্লিনিকের কর্মীদের কাছে ১৯৯২-র ১৪ই জানুয়ারি এক ভিডিয়ো টেপ করা ভাষণে টেরেজা বললেন, "আমরা সরকারী দান গ্রহণ করি না, ধর্মমণ্ডলীর দান গ্রহণ করি না, আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদের ওপর নির্ভরশীল।" কুড়ি মিনিট পরে ঐ একই ভাষণে বললেন, সরকারের সাহায্যে আমরা কুষ্ঠরোগীদের পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্র তৈরী করছি। সরকার জমি দেয়, আমি বাড়ী তৈরির মালপত্র কিনি। কুষ্ঠরোগীরাই বাড়ী বানায়, আমি তাদের টাকা দিই।' (পৃ ২০)

মাদার টেরেজার খ্যাতিটা যে বানানো, খোলা-চোখে দেখলে তিনি যে কলকাতা-চালচিত্রের অপরিহার্য প্রতিমা নন, তার একটি নমুনা: 'ব্রিটিশ টেলিভিশন তারকা টিম পিগট স্মিথ ১৯৯৬-এর বসন্তে ক্যালকাটা ক্রনিকল নামে আট খণ্ডের একটি টি ভি সিরিয়াল প্রদর্শন করেন। ঐ সিরিয়ালে টেরেজার কথা উল্লেখ করা হয়নি। আমি তাঁকে শুধিয়েছিলাম, কলকাতায় গিয়ে কি তিনি টেরেজার কার্যক্রমের কোনই চিহ্ন দেখতে পাননি?—মোটেই না। তিনি জোরের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন (পৃ ৭১-৭২)।

স্মিথের অন্য একটি মন্তব্যও শিক্ষাপ্রদ: 'মড়াখেকো শকুন ছাড়া যেসব পশ্চিমা কলকাতায় আসে তারা কলকাতার স্বাভাবিকতা দেখে বিস্মিত হয়' (ঐ)। বাস্তবিক, শোষণপীড়িত এই বিশ্বে নিউ ইয়র্ক, লন্ডন কিংবা প্যারিসের মতো, অথবা কারাকাস, ম্যানিলা বা ইসলামাবাদের মতো, দারিদ্র্য—এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এক স্বাভাবিক জিনিস। টেরেজার কাছে দারিদ্র্য কিন্তু অবাঞ্ছিত নয়, কেননা দারিদ্র্য আছে বলেই তো তিনি আছেন। দারিদ্র্যই তাঁর সেবা-ব্যবসায়ের প্রধান পুঁজি। তাই দারিদ্র্য দূর করার সংগ্রামে তিনি অনুপস্থিত, এমনকি সে-সংগ্রামের বিরোধী। এটাও লক্ষ্যণীয় যে সেই দারিদ্র্যের নানাবিধ ভয়াবহ প্রকোপের মধ্যে কুষ্ঠরোগকেই তিনি তাঁর বিপনন-কর্মে 'স্পেশাল ইউ এস পি'র মর্যাদা দিয়েছিলেন। ক্যাথলিক ধর্ম আর যিশু খ্রিস্টের হাতের ছোঁয়ায় কুষ্ঠরোগ সেরে যাওয়ার গল্প যে অবিচ্ছেদ্য! অরূপ হিসেব করে দেখিয়েছেন, শুধু টেরেজার প্রচারে প্রতিহত হয়ে কত বিদেশী পর্যটক 'কুষ্ঠরোগীর শহর' কলকাতাকে পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং তার ফলে কী পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা আমরা হারিয়েছি!

অরূপের বইয়ের সবচেয়ে জোরের জায়গা হল এর বস্তুনিষ্ঠতা। প্রায় তদন্তভিত্তিক সাংবাদিকতার ঢঙে—কখনো কখনো বেশ ঝুঁকি নিয়ে—তিনি নিজে তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছেন। ফলে সংগৃহীত তথ্য থেকে তিনি যেসব সিদ্ধান্তে পৌঁছান, সেগুলি অকাট্য বলেই মনে হয়। কিন্তু যুক্তিশাস্ত্রের দিক থেকে এইভাবে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর যে বিপদ সেটা অরূপের ওপরেও বোধহয় কিছুটা অর্শায়। তিনি কতকগুলি 'অকাট্য' তথ্যের ভিত্তিতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন; এবার অন্য কোনো লোক অন্য কিছু 'অকাট্য' তথ্যের ভিত্তিতে অন্য এক সিদ্ধান্তে পৌঁছলে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। যেমন, মাদারের সেবাকেন্দ্রগুলোর সঙ্গে যুক্ত কিছু কিছু ডাক্তার মাদারের কর্মকাণ্ডের যে-বিবরণ দেন, তা বীভৎস ও কুৎসিত নয়। অনেকেই টেরেজার আশ্রমগুলোর চিকিৎসা-পরিষেবার প্রশংসা করেছেন। এঁরা অরূপের মাদার-চিত্রণের সঙ্গে একমত হবেন না। এসব আপত্তির মোকাবিলা অরূপ কীভাবে করবেন?

আমার নিজের মনে হয়, তথ্যনিষ্ঠা বজায় রাখার পাশাপাশি আরেকটা কাজ অরূপ করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। সেটা হল, তাত্ত্বিক ও মতাদর্শগত জায়গাটা পরিষ্কার করা। তাঁর আপত্তি কি টেরেজা নাম্নী এক মহিলার অসাধু কাজকর্মের বিরুদ্ধে, নাকি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম মানুষের দারিদ্র্য ও বঞ্চনাকে নিয়ে যেভাবে খেলা করে তার বিরুদ্ধে? আমার মনে হয়েছে, তাঁর প্রধান আপত্তি প্রথমটা নিয়ে, দ্বিতীয়টা নিয়ে নয়। কার্যত তিনি দেখিয়েছেন, ক্যাথলিক ও অ-ক্যাথলিক অন্যান্য বহু ধর্মপ্রতিষ্ঠান সত্যি সত্যিই গরিব মানুষের সেবা করে, কেবল টেরেজাই নানান কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে নিজের ধর্মীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক আখের গুছিয়েছেন। ঠিক এই জায়গাতেই অন্য কেউ যদি অন্যরকমের 'অকাট্য' তথ্য পেশ করেন তাহলে কিন্তু এ বইয়ের অস্তিত্বের মূল কারণটাই (*raison d'etre*) ধসে পড়ে। ধর্মীয় সেবার মতাদর্শগত, তাত্ত্বিক ও নৈতিক দিকটাকে এড়িয়ে না গেলে তাঁকে এ সমস্যার মুখোমুখি হতে হত না।

তবে যাঁরা মনে করেন, টেরিজা কিছু 'ভালো' কাজ করেছেন, সুতরাং তাঁর অনেক খারাপ কাজ ক্ষমা করে দেওয়া উচিত, তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া যায় না। এটা তো ঘটনা যে হিটলারের মতো লোকও তার রাজনৈতিক স্বার্থে জনগণের জন্য কিছু 'ভালো' কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। বস্তুত, কিছু 'ভালো' কাজ না করলে চরম ঘৃণ্য কোনো সংস্থাও টিকে থাকতে পারে না। ঐ 'ভালো' কাজটাই তাকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেয়, যা ভাঙিয়ে সে তার আসল উদ্দেশ্য হাসিল করে। বেশি দূরে নয়, আপনার পাড়ার তপন-শূকরদের দিকে তাকালেই একথার সত্যতার প্রমাণ পাবেন। সুতরাং ক্যাথলিক ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে টেরেজার প্রতিষ্ঠান যদি কিছু 'ভালো' কাজ করে থাকে তার দ্বারা প্রমাণ হয় না যে তাঁর লক্ষ্য ছিল মহৎ। কেবল এইটুকু প্রমাণ হয় যে তিনি ছিলেন সম-ব্যবসায়ীদের তুলনায় অসম্ভব বুদ্ধিমতী।

কাজেই, মুক্তকণ্ঠে বলব যে কিছু তাত্ত্বিক অসংহতি সত্ত্বেও অরূপবাবুর বহুপরিশ্রমে রচিত এই তথ্যনিষ্ঠ বইটি অত্যন্ত কাজের হয়েছে। সযত্নলালিত একটা মিথ্যের বুদ্বুদকে ফাটিয়ে দেওয়ার কাজে, বাঙালি মধ্যবিত্তের হারানো আত্মসম্মানবোধ ফিরিয়ে আনার প্রয়াসে তাঁর এই বই এক দুরন্ত হাতিয়ার।

উমা

মাদার টেরেসা

প্রস্তাব, আশীর্বাদ ও প্রত্যাখ্যান

মাদার টেরেসা অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। ...কুষ্ঠরোগীদের জন্য টিটাগড়ে গান্ধীজি প্রেমনিবাস বলে একটা কুষ্ঠাশ্রম চালাচ্ছেন। ...কুষ্ঠরোগীরা অল্পদিনেই ছানিতে আক্রান্ত হন। ... মাদারের ইচ্ছায় ও আমাদের সহযোগিতায় ১৯৭২ সাল থেকে ছানি Operation চলছে। প্রায় ১০০০ রোগীর Operation হয়েছে। সেই কুষ্ঠরোগীরা এখন তাঁত বুনছেন ও Bandage তৈরী করছেন।

মাদার আমাদের আশীর্বাদ করেছেন অকুণ্ঠভাবে। — আমরা মানে চোখের ডাক্তারেরাও আনন্দে গদগদ।

মাদার টেরেসার অন্য একটি সংস্থার নাম 'নির্মল হৃদয়', কালিঘাট মন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত। ... আমি সেখানে বহুবার বহু মৃত্যুপথযাত্রীদের চোখের জন্য চিকিৎসা করেছি।

একদিন মাদারকে বলেই ফেললাম মাদার এই পিছনের ঘরে তো শুধু মৃত ব্যক্তি ও ডাক্তার বা স্বেচ্ছাসেবকই থাকে। আমি যদি সুযোগ পেতাম তাহলে মৃতের চোখ দুটি চক্ষুদান হিসাবে তুলে নিয়ে চক্ষুব্যাঙ্কে জমা দিতাম।

মাদার সমস্ত শুনে বললেন এটা খুব ভাল প্রস্তাব, অন্ধতা নিবারণের জন্য। কিন্তু এটা কোনরকমে সম্ভব নয়। কারণ কোন মৃতপ্রায় ব্যক্তি এই অজুহাতে রাস্তাতেই প্রাণত্যাগ করবেন। এখানে যদি তাঁরা জানেন যে মরে গেলে চোখ দুটো হারাতে হবে, তাহলে রাস্তায় মৃত্যুই ভাল।

এই ঘর ভর্তি মৃত্যু পথযাত্রীরা এখানে এসে প্রাণত্যাগ করেন পরম শান্তিতে। তাঁরা আসেন একটা আশ্রয়ের জন্য, চোখ হারাবার জন্য নয়। ডাক্তার, আপনার এই এই অনুরোধে রাজি হতে পারলাম না, আমি দুঃখিত।

আমি কিন্তু হতাশ হইনি। বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে এই প্রস্তাব করেই চলেছি, হ্যাঁ, সাড়াও মিলেছে। —**ফিরে দেখা, ডাঃ ইন্দ্রশেখর রায় (কলকাতা, জুলাই ২০০৪), পৃ: ৪৬-৪৭।**

*সামান্য কিছু যতিচিহ্নের সংযোগ ছাড়া হুবহু পুনর্মুদ্রিত। স.ম.

সংগঠন সংবাদ

হরিণঘাটায় খেলাধূলা

যুক্তির নিরীখে সামাজিক উৎসব—এই ভাবনাচিন্তা থেকে ১৯৮২ সনে নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব পড়ে ওঠে। উক্ত ক্রীড়া উৎসব থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আশপাশের বিভিন্ন গ্রামে বাৎসরিক ক্রীড়া উৎসব গড়ে ওঠে। কোথাও ক্রীড়া উৎসব নামে কোথাও বা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নামে। খেলাধূলার প্রতি একটা সাধারণ আকর্ষণের জায়গা থেকেই প্রায় বেশির ভাগ জায়গায় উদ্যোগগুলো গড়ে উঠেছে। এ বছর নিম্নলিখিত সংগঠনগুলি আমাদের এলাকায় গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করে। বড়জাগুলী আঞ্চলিক গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব কমিটি (১৯.১২.১০), নারায়ণপুর গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব কমিটি (৮-৯.১.১১), নবতরুণ সংঘ, হরিণঘাটা (২৩.১.১১), দিশারী, সুকান্ত পল্লী, হরিণঘাটা (২৩.১.১১), সংঘশ্রী, কপিলেশ্বর (২৩.১.১১), প্রগতি সংঘ, নারায়ণপুর (২৯.১.১১-৩০.১.১১), বিদ্রোহী সংঘ উঃ রাজাপুর (৫.২.১১-৬.২.১১), শিবশক্তি সমিতি, ভাতশালা (৬.২.১১)।

এছাড়া হরিণঘাটা আন্তঃগ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৩.২.১১ তারিখে। যে সকল সংগঠন গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করে থাকে শুধু সে সকল সংগঠনই আন্তঃগ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবে অংশগ্রহণ করতে পারে। গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলি পর্যায়ক্রমে এক এক বছর আন্তঃগ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতি বৃদ্ধির কথা মনে রেখেই আন্তঃগ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবটি গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবে অংশগ্রহণকারী সংগঠনগুলি যেন পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ এলাকায় অনুষ্ঠিত করার উদ্যোগ নেয় সেভাবে তাদেরকে উৎসাহিত করা হয়। বর্তমান বর্ষে বড়জাগুলী আঞ্চলিক গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব কমিটি ১৩.২.১১ তারিখে গোপাল অ্যাকাডেমির খেলার মাঠে আন্তঃগ্রামীণ ক্রীড়া উৎসবের আয়োজন করে।

বড়জাগুলী আঞ্চলিক গ্রামীণ ক্রীড়া উৎসব কমিটি বাৎসরিক ক্রীড়া উৎসব ছাড়াও এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রদের মধ্যে বিগত বছর থেকে নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু করেছে। চতুর্দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ২২-২৪শে জুলাই'১০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র-শিক্ষক ও স্থানীয় জনসাধারণের প্রবল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে টুর্নামেন্টের সমাপ্তি ঘটে। বিগত ৮ই আগস্ট'১০ তারিখে কমিটির অ্যাথলেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হয়। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিভিন্ন গ্রামের ছেলে-মেয়েরা প্রশিক্ষণ নিতে আসে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি কমিটির বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে একটি অতি প্রয়োজনীয় সংযোজন।

হরিণঘাটা ব্লকের এই এলাকাভিত্তিক ক্রীড়া উদ্যোগ ষোল আনা এলাকার মানুষ নির্ভর। আমাদের উদ্যোগগুলোতে প্রাচুর্যের ছাপ নেই কিন্তু চলমান থাকার নিদর্শন আছে।

নিরঞ্জন বিশ্বাস

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 R.N. 37275/80 Rs. 15.00

৩১ বর্ষ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১ ১৫ টাকা

পুস্তক তালিকা

ছাপা আছে

১. বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১) সংকলন	৩৫.০০
২. যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪০.০০
৩. বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (৫ম প্রকাশ) সংকলন	৪২.০০
৪. প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
৫. তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
৬. বাংলা বন্‌ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
৭. এটা কী ওটা কেন, সংকলন	৫০.০০
৮. 'আমরা জমি দেই নি, দেব না'	১০.০০
৯. আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান, সংকলন	৫০.০০
১০. আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
১১. প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
১২. বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	১০০.০০
১৩. শেকলভাঙা সংস্কৃতি (যন্ত্রস্থ)	

ছাপা নেই

অতীন্দ্রিয় অলৌকিকের অন্তরালে (সংকলন)
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান (২য় খণ্ড)
স্বাস্থ্যের বৃত্ত
প্রমিথিউসের পথে
জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?
শেকলভাঙা সংস্কৃতি - ৪
হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান
সংকলন
কী আর কেন
চলতে ফিরতে
বিজ্ঞানকে মুখোশ করে
সাপ নিয়ে কিংবদন্তী
প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় ৪
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ (জানুয়ারি ২০০০১ম)
খাবার নিয়ে ভাবার আছে (৩য়)
লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি
ছেচল্লিশের দাঙ্গা : সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিজের মুখোমুখি

উৎস মানুষ-এর প্রাপ্তিস্থান

কলকাতা: বই-চিত্র (কফিহাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদি বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙ্গা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়)। র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), ডি আর সি এস সি ঢাকুরিয়া অফিস (দক্ষিণাপন-এর উল্টোদিকে)। **বর্ধমান**: জ্ঞানতীর্থ (বি সি রোড), বুড়োরাজ পুস্তকালয় (দত্ত সেন্টার), নবীনা (বাসযাত্রী বিশ্রাম ভবন, কার্জন গেট), হুইলার (রেলওয়ে স্টেশন)। **আগরতলা**: সৈকত প্রকাশন। **দুর্গাপুর**: অক্ষয় বুক স্টল (সিটি সেন্টার), সিটিসেন্টার বুক স্টল, সিটি বুক হাউস (সিটি সেন্টার), নব পুস্তকালয় (স্টেশন বাজার), হুইলার (রেল স্টেশন)। **বোলপুর**: রেলওয়ে স্টেশন। **কাটোয়া**: ভাস্কর এন্টারপ্রাইজ (কাছারি রোড)। **সিউড়ি**: দেশবন্ধু (ইন্দ্রপল্লী)। **আরামবাগ**:ছাত্রমহল (আরামবাগ ফাঁড়ির উল্টোদিকে)।

উৎস মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক কলকাতা-৭০০০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং শান্তি মুদ্রণ ৩২/৩, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯, দূরভাষ-৯৪৩৩০৯৯৯৩১ হইতে মুদ্রিত। বাঁধাই- নিবারণ সাহা।